আলী রীয়াজ

গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম

গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম

আলী রীয়াজ

মুক্তধারা

www.pathagar.com

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের লেখক কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১৪৪৩

প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা [স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৫
প্রচ্ছদ- শিল্পী সমর মজুমদার

কম্পিউটার কম্পোজ
উদয়ন প্রেস লিঃ
৬১ তাঁতী বাজার ঢাকা ১১০০

মুদ্রাকর প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস ৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা ১১০০

মূল্য সাদা ৪০.০০
লেখক কাগজ

GANABIC ... NAMADHYAM
[Mass Comm ... ngladesh]
By Ali Riaz
First Edition February ...
Cover Design Samar Ma...der
Publisher C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj Dhaka 1100
Bangladesh

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রিয় শিক্ষকদ্বয়
জীবনানন্দ বড়ুয়া ও
কিউ এ আই এম নূরউদ্দিন

www.pathagar.com

এই লেখকের

বাঙালী জাতীয়তাবাদ (১৯৭৯)
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্য (১৯৮৩)
ছাত্র আন্দোলনের আগামী দিন (১৯৮৩)
লেখকের দেশকাল (১৯৮৪)
শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৮৭)

www.pathagar.com

ভূমিকা

যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক আমার রচনাগুলোকে একটি গ্রন্থে বন্দী করবার ইচ্ছে দীর্ঘদিনের। কিন্তু আমার চিরকালীন আলস্যের কারণে তা হয়ে উঠছিলো না। প্রবাসে শিক্ষার্থীর জীবন-যাপনের ফাঁকে স্বল্প সময়ের জন্যে দেশে ফিরলে '৮৮'র জুন মাসে উচ্চতর সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের একটি সেমিনারে পাঠের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র বিরোধী আইন সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ তৈরির জন্যে ডঃ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর আমাকে আগ্রহী করে তোলেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ও চাপের মুখে এই বিষয়ে রচনা তৈরিতে প্রবৃত্ত হই এবং সে সময়েই এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করি। অত্যন্ত স্বল্প সময় সত্ত্বেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রচনাগুলো থেকে আমি পাঁচটি রচনা বেছে নিই একটি বইয়ের আকার দেবার জন্যে। রচনাগুলো নির্বাচনের সময় একটিমাত্র বিবেচনাই কাজ করেছে, তা হলো ঃ লেখাগুলো যেনো আমাদের গণমাধ্যমগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে পারে। ধারণা বলতে বাইরে থেকে দেখা নয়, ভেতর থেকে বিশ্লেষণ করা ধারণার কথাই আমার বিবেচ্য ছিলো। সেই বিবেচনা থেকেই এই রচনাগুলোকে দুই মলাটের ভেতর বন্দী করা হয়েছে।

এই পাঁচটি রচনার মধ্যে তিনটি পূর্ব-প্রকাশিত। 'গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম' নামধেয় রচনাটি বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের পত্রিকা 'নিরীক্ষা'য়, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাংবাদিকতা' নামধেয় রচনাটি 'ইদানীং' নামের একটি লিটল ম্যাগাজিনে এবং 'রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারী প্রতিমা' শীর্ষক রচনাটি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'য় এবং নারী সংহতি প্রকাশিত 'গণমাধ্যম ও নারী' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত। শেষোক্ত রচনাটি প্রকৃত পক্ষে নারী সংহতি আয়োজিত 'বাংলাদেশে গণমাধ্যম ও নারী নির্যাতন' বিষয়ক দু'দিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্যেই রচিত। অপর দুটি রচনা 'তথ্য সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলাদেশ' এবং 'সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধী আইন' দুটো সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ। প্রথমোক্তটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত সেমিনারে এবং দ্বিতীয়োক্তটি উচ্চতর সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের একটি সেমিনারে পঠিত। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৮ সালের দীর্ঘ সময় পরিসরে রচিত বলে কোনো কোনো বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একাধিক রচনায়— আশা করি প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে সংঘটিত এই পুনরাবৃত্তি পাঠকদের বিরক্ত করবে না।

www.pathagar.com

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা আক্ষরিক অর্থেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অগ্রজপ্রতিম ও বন্ধুবৎসল মুহম্মদ নূরুল হুদার সাহচর্য ও সহযোগিতা দশ বৎসরের বেশি সময় ধরে আমাকে বহুভাবে ঋণী করেছে। তাঁর ঋণ স্বীকার করাই আমার কাছে এক ধরনের ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়, তাই এ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলাম।

বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরি ও প্রকাশনার কাজে অনুজপ্রতিম জিল্লুর রহমান ও মহসীন আল আব্বাসের সহযোগিতা বিস্মৃত হবার নয়। তাদের ধন্যবাদ।

বইটি আমি উৎসর্গ করেছি আমার দুই প্রিয় শিক্ষককে যাঁর একজন আমাকে বাংলা লিখতে শিখিয়েছেন, অপরজন পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যোগাযোগের বিশাল ভুবনের সাথে। যদিও আমি জানি, এই বই পড়ে তাঁরা উভয়েই আমার অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার জন্যে লজ্জিত হবেন, তবু আশা করি, অযোগ্য ছাত্রের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁদের চরণে ঠাঁই পাবে।

ঢাকা
জুলাই '৮৮

আলী রীয়াজ

www.pathagar.com

গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম ৯
স্বাধীনতা-উত্তর সাংবাদিকতা ১৯
তথ্য সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলাদেশ ২৯
রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারী-প্রতিমা ৪৭
সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধী আইন ৫৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গণবিচ্ছিন্ন গণমাধ্যম

আমাদের গণমাধ্যমগুলো, অর্থাৎ সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রায় ধ্রুব সত্যে পরিণত হতে চলেছে যে, ওগুলোর সাথে জনগণের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। এই মাধ্যমগুলোকে আমরা যতই 'গণমাধ্যম' বলে চেঁচাই না কেনো বাস্তব অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ওগুলো আর 'গণমাধ্যম' নেই, হয়ে উঠেছে 'গণ-বিচ্ছিন্ন মাধ্যম'। আমাদের ম্যাস-মিডিয়া বা গণমাধ্যমগুলোর গণবিচ্ছিন্নতা আজ, কাল বা পরশু'র ব্যাপার নয়। বরং একটি দীর্ঘ সময়ের নীরব অবহেলারই পরিণতি। এ দেশের গত তিরিশ বছরের সামাজিক ইতিহাসের বা বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের ফল বললেও বোধ করি ভুল বলা হবে না। তার পেছনে যে কারণ আর যে ঘটনাই কাজ করুক না কেনো এটা ঠিক যে, আজকে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর করুণ পরিস্থিতির জন্যে আমরাই সর্বাংশে দায়ী। আমাদের চেষ্টার ফলে বা অবহেলার পরিণতিতে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর এই করুণ চেহারা দাঁড়িয়েছে।

আমাদের গণমাধ্যমগুলোর গণবিচ্ছিন্নতা দু'ধরনের। প্রথমত আমাদের গণমাধ্যমগুলোতে যা পরিবেশিত হয় তার 'ভেতরে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-দুঃখ-দৈন্য প্রতিফলিত হয় না। দ্বিতীয়ত এই গণমাধ্যমগুলোতে যা পরিবেশিত হয় তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছুতে পারে না। প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাদের গণমাধ্যমগুলোর পরিবেশনার 'গুণপনায়' কিংবা জনগণের রুচি, প্রত্যাশা, গ্রহণক্ষমতা ইত্যাদির নিম্নমানের কারণে আমাদের গণমাধ্যমগুলোতে পরিবেশিত বার্তা (message) একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির সীমার বাইরে কোনদিনই যেতে পারে নি। এই দু'ভাবে সৃষ্ট গণবিচ্ছিন্নতার পতিত হয়েছে আমাদের 'গণমাধ্যমগুলো'। আর আমরা সে সম্পর্কে কম-বেশি অবগত থাকা সত্ত্বেও আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও চিরাচরিত অভ্যাসের কারণে তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। 'যা আছে তাই ভালো'-এমনি একটি মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব আমাদের জীবনের সর্বত্রই কমবেশি বিরাজমান। আর এই মানসিকতা অতি সম্প্রতি তো দূরে থাক দূর ভবিষ্যতেও অপসারিত হবার কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে এই দুরবস্থার স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা যেমন পরিদৃষ্ট হচ্ছে না তেমনি এই দুরবস্থা থেকে মুক্তিরও কোনো উপায় আবিস্কৃত হচ্ছে না।

www.pathagar.com

গণমাধ্যমগুলোর গণবিচ্ছিন্নতার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রাথমিকভাবে আমাদের দু'টো প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমত আমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর অবস্থান কোথায়। দ্বিতীয়ত আমরা এই গণমাধ্যমগুলোর কাছে কোন্ ভূমিকা প্রত্যাশা করি। প্রথম প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন এবং তার উত্তরের জন্য প্রয়োজন বিশদ ও বিশ্লেষণী আলোচনা। সে আলোচনা আমাদের মূল বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে দেবে বলে আপাতত তা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। বরং আপাতদৃষ্টিতে আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটটি স্মরণে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিভাষায় আমাদের মতো দেশগুলোকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ বলে চিহ্নিত করা হয়। এবং এসব দেশের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে প্রধানত শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আওতাধীন বিবেচনা করা হয়। যোগাযোগের সীমিত মাধ্যম ও উপকরণ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যোগাযোগের মাধ্যমের এসব উপকরণ আমরা কিভাবে ব্যবহার করবো তার ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের মাধ্যমগুলো কোন্ ভূমিকা পালন করবে তার উত্তর। আমাদের এই মাধ্যমগুলো প্রধানত দু'ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রথমত এর ভূমিকা হতে পারে নেহাত-ই বর্তমান সমাজ সংগঠনের বিভিন্ন ব্যবস্থাদি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা এবং এর ভোক্তাদের (কনসিউমার) বিনোদনের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত বর্তমান ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ অনুসন্ধান করা, সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তনের মুখে ঠেলে দেয়া এবং এর ভোক্তাদের শিক্ষিত করে তুলে ঐ পরিবর্তনকে নিশ্চিত করা—উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো। তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত দেশের, লক্ষ লক্ষ ত্রুটি কণ্টকিত সমাজের সদস্য হিসেবে সঙ্গত কারণেই আমাদের যোগোযোগ মাধ্যমগুলোর কাছে আমরা দ্বিতীয়োক্ত ভূমিকাই প্রত্যাশা করবো। আর সেই ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার নিরিখেই আমাদের মাধ্যমগুলোর গণবিচ্ছিন্নতার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হবে।

আমাদের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে আমরা দু'টো ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি। একটি ভাগে থাকবে মুদ্রিত মাধ্যমগুলো (print-media) যেমন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বই প্রভৃতি। অন্যটিতে অমুদ্রিত মাধ্যম বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো, যেমন বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথম ভাগটিই সবচেয়ে পুরোনো ঃ উপমহাদেশে প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের হিসেব ধরলে তার বয়স প্রায় দু'শো বছর। আর সর্বাধুনিক হচ্ছে টেলিভিশন, বয়সে 'একেবারে শিশু'-ষোলো বছর। বয়সের হিসেবে তাদের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন ভূমিকার দিক থেকে একে অপরের চেয়ে পিছিয়ে নেই। আর

www.pathagar.com

প্রভাবের কথা বিবেচনা করলে মুদ্রিত মাধ্যমের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী হচ্ছে অমুদ্রিত মাধ্যমগুলো, বিশেষত বেতার ও চলচ্চিত্র।

।। দুই ।।

পরাধীন সংবাদপত্র, নতজানু সাংবাদিক

আমাদের সবচেয়ে পুরোনো যোগাযোগ মাধ্যমটিই সবচেয়ে কম প্রভাবশালী—এটা আপাতত বিস্ময়কর মনে হলেও একথা ঠিক যে, এই বিস্ময় অত্যন্ত সাময়িক। যে দেশে শতকরা আশি বা তারও বেশি লোক অশিক্ষিত অক্ষরজ্ঞানহীন সেখানে মুদ্রিত মাধ্যমগুলো কোনোভাবেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। জনগণের মূল অংশের কাছেই যদি তার বার্তা না পৌঁছলো তবে তার মূল্য কি আদৌ কিছু থাকে? গত ১৫০ বছরে পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে সার্কুলেশন—তাতে এটুকু বোঝা যায় যে প্রভাব ধীর গতিতে হলেও বাড়ছে। কিন্তু পত্রিকার সংখ্যা যে হারে বেড়েছে পাঠকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়েনি। আর তেমনটি আশা করাও বোধকরি বোকামি। আমাদের মূল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে যে কর্মকাণ্ড তাদেরকে অঙ্গীভূত না করা পর্যন্ত তার কাছে জনগণের সহায়ক ভূমিকা আশা করা বোধকরি যুক্তিযুক্ত নয়। নিরক্ষরতাকীর্ণ সমাজে মুদ্রিত মাধ্যমের এই সমস্যারই প্রতিফলন দেখতে পাই জনগণের কাছে পত্রিকার বার্তা না পৌঁছানোর ভেতরে। এ সমস্যা দশ, বিশ বা একশো বছর আগে যেমন ছিলো আজও ঠিক তেমনি আছে। হয়তো আগামীতেও তার চেহারার আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে না।

সমস্যার শেষ এখানেও হয়নি, বরং শুরু হয়েছে মাত্র। অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে, যেমন সংবাদপত্রের পাতায় জনগণের কথা আদৌ ফুটে উঠছে কিনা তার কথাই ধরা যাক। আজ থেকে একশো বছর আগে আমাদের সংবাদপত্রগুলো যে পরাধীনতার বিবরে আবদ্ধ ছিলো আজ তার বাইরের চেহারা পাল্টালেও তার ভেতরে, চরিত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে আমাদের জনজীবন প্রতিফলিত হতো না। কেননা তারা স্বাধীন ছিলো না—না সংবাদপত্র, না সাংবাদিক। পাকিস্তানী আমলের ২৫ বছরেও সে চেহারা পাল্টায়নি। কিন্তু আশা ছিলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে এই সমস্যাটির মুখোমুখি হতে হবে না। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এতো রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সত্ত্বেও তা থেকে আমরা মুক্তি পেলাম না। তা হলে কি আমরা ধরে নেবো রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা রাষ্ট্র—ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই? এতো সহজে সে কথা বলা বোধহয় সম্ভব নয়। তবে এটা

www.pathagar.com

ঠিক যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্যে যাদের কাছ থেকে আঘাত আসে তার প্রধান শক্তিই হচ্ছে সরকার। কি ব্রিটিশ আমলে, কি পাকিস্তানী আমলে—এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশে তার অন্যথা ঘটেনি। কিন্তু পরাধীনতার শৃঙ্খল শুধু এইভাবে আসেনি, আসে না। এসেছে অন্যভাবেও—মালিকানার সূত্র ধরে। তখন প্রায় হাত-পা বেঁধে ঝাঁপ দিতে হয়েছে সাংবাদিকদের—হয় আগুনে নয় তো জলে।

মালিকানার সূত্র ধরে আসা এই পরাধীনতার শৃঙখল বেশ চমৎকারভাবেই আসে। সংবাদপত্রের মালিকানা হতে পারে তিন ধরনের—১. ব্যক্তি মালিকানাধীন ২. রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র বা তাদের সমর্থনপুষ্ট ৩. সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র। ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদপত্রের কথাই ধরা যাক প্রথমে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলোকে বেশ 'স্বাধীনই' ঠেকে—না আছে দলের আদর্শের কাঁটা, না আছে সরকারের তোষামোদির প্রয়োজন। আসলে কিন্তু তা নয়। মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে কখনো রাজনৈতিক দলগুলোকে তোষামোদি করতে হয়। আবার কখনোবা সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার চেয়েও জোর গলায় সরকারকে সমর্থন যোগাতে হয়। তাতে সাংবাদিকের ইচ্ছে থাকুক কিংবা নাই থাকুক, বিষয়টি যৌক্তিক হোক কিংবা নাই হোক। আর তাছাড়া রয়েছে বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা। অন্যথায় পত্রিকা বন্ধ হবার জোগাড় হবে। যেনে শোনে পত্রিকা মালিক তো আর ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারেন না। আর ব্যবসায়িক পাকচক্রে পড়ে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের স্বাধীনতা তো শিকেয় ওঠেই, কখনো বা সংবাদপত্রের মালিকের স্বাধীনতা অবধি ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের দেশে এই অবস্থা আমরা পাকিস্তানী আমলে বেশ ভাল ভাবেই প্রত্যক্ষ করেছি। ফলে স্বাধীন সংবাদপত্রের তো প্রশ্নই ওঠেনা, উদার ও নির্ভীক কাগজেরও সন্ধান পাইনি। রাজনৈতিক দলের মুখপত্রের কাজই হচ্ছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের দল আর আদর্শকে বড় করে তোলা—তা সত্য হোক কি মিথ্যা হোক, জনগণের সুদিন ডেকে আনুক কি সর্বনাশ ঘটাক, তাতে কিছু যায় আসে না। সেখানে যে সব সাংবাদিক থাকেন তাদের অনেকেই হয়তো দলীয় কর্মী হিসেবে সম্মানের দাবিদার কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে, নিরপেক্ষ সংবাদদাতা হিসেবে তার কানাকড়ি মুল্যও হয়তো থাকে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র প্রসঙ্গে আলোচনা বাহুল্য। সংবাদপত্রের মর্যাদা লাভই অনেক সময় ওগুলোর ভাগ্যে জোটে না। বড় জোর ছাপা কাগজ হতে পারে। এইসব সংবাদপত্রে যে সব সাংবাদিক থাকেন তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা 'জলের মাছ ডাঙায় বাসের' মতো হয়ে দাঁড়ায়।

তবু এগুলোর ফাঁক গলিয়ে মেরুদণ্ড শক্ত করে কেউ কেউ দাঁড়ান। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। আমাদের দেশে গত তিরিশ

www.pathagar.com

বছরে হাতে গোনার মতোও নয়। কেননা যতটা না সংবাদপত্র পরাধীন তারও চেয়ে অনেক বেশি পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা আমাদের সাংবাদিকরা, যে শেকল সরকারের সৃষ্টি নয়-মালিকদেরও উপহার নয়—নিজেদের চরিত্রের দুর্বলতায় যার জন্ম। আমাদের সাংবাদিকরা চাপে পড়ে কিংবা ভয়ে সবসময়ই নতজানু হয়ে থাকেন। এটি তাদের রক্তে মাংসে এমনভাবে মিশে গেছে যে কখনো কখনো নিজেরাই দল বেঁধে হাতে শেকল বেঁধে নেন। ফলে সংবাদপত্রগুলো হয় 'না ঘরকা না ঘাটকা'—না জনগণের না সরকারের—আর দু'য়ের বিস্তর ব্যবধান তো চিরকালই থেকেছে।

আগামী নির্মাণের সৈনিক নয়

বিগত দিনে আমাদের সংবাদপত্রগুলোর এই 'না ঘরকা না ঘাটকা' অবস্থায় সাহসী ভূমিকা নিতে পারতো সাময়িকপত্রগুলো। তাতে সংবাদপত্রের দায়-দায়িত্ব পালন সম্ভব হতো না, কিন্তু জনমত প্রতিফলনের একটা পথ অন্তত খোলা থাকতো। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য, তাও হয়নি। অস্বীকার করবো না যে, আইনের বাধা-নিষেধের কালো হাত সাময়িকপত্রের জগতেও প্রসারিত হয়েছিলো; তবু তুলনামূলকভাবে এদের সুযোগ সম্ভাবনা উভয়ই ছিলো বেশি। লজ্জার বিষয় শুধু এখানেই নয়, তারও চেয়ে বড় ক্ষেত্রে রয়েছে ঃ সাতচল্লিশোত্তরকালে আমরা সাময়িকপত্র বলতে সাহিত্য পত্রিকা ভিন্ন আর কিছুই বুঝিনি। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সাময়িকপত্রের যে ক্ষীণস্রোত—প্রবাহ ছিলো সাতচল্লিশোত্তরকালে সে ধারা আর টিকে থাকেনি। চল্লিশের বা পঞ্চাশের দশকে আমাদের দেশে সাময়িক পত্র বেরিয়েছেই কম। ষাটের দশকে তার পরিমাণ অগুনতি হলেও ততদিনে সাময়িকপত্রের ধারণায় একটা ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়ে গেছে—এমনকি সাহিত্য সংস্কৃতির জগতেও সমাজলগ্ন চিন্তা ভাবনার স্রোত প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে তৎকালীন সাময়িকপত্রগুলো যে ভূমিকা পালন করেছে তা একপেশে এবং বৃহদর্থে নেতিবাচক ভূমিকা।

আমাদের তৎকালীন সাময়িকপত্রগুলোর ভূমিকা কি ছিলো তা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে সাহিত্য যে সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ তাও বোধহয় এসব সাময়িকপত্র প্রকাশকদের অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন। নতুবা তাদের ধারণায় সাহিত্য হয়ে উঠেছিলো আলাদা জগৎ—জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। আর সে কারণেই সে সময়কার সাময়িকপত্রগুলো গল্প, কবিতা আর এসব বিষয়ে আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই ছাপেনি। এমনকি সাংস্কৃতিক জগতে যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' চালু করানো হচ্ছিলো তা নিয়েও তারা চিন্তিত হননি। নৈরাশ্য,

www.pathagar.com

নৈরাজ্য, 'অবক্ষয়', কালিমা, ক্লেদ ও পচন—যুগের এই লক্ষণগুলো তাদের রচনায় চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। তাতে করে আংশিকভাবে জীবন প্রতিফলিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি মোটেই। যদি জনমতের প্রতিফলনই ঘটতো তবে এই নৈরাশ্যের অন্ধকারের ভেতর থেকে প্রাণপণ করে জেগে ওঠা বাংলাদেশের চেহারাও অবলীলায় ফুটে উঠতো। এরই ফলে এইসব সাময়িকীর লেখক, প্রকাশক ও পাঠকেরা একই বৃত্তের ভেতরের বাসিন্দা ছিলেন, তার বাণী কোনোভাবেই বিশাল জনগোষ্ঠীর দ্বারে পৌঁছুতে পারেনি।

আরো সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলে ব্যাপক জনগণের জন্যে আদৌ কোনো বাণী সে সময়কার সাময়িকপত্রগুলোতে ছিলো না। সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনা আর তার ফলাফল নিয়েই রচিত হতো এ সময়কার সাময়িকপত্রগুলোর রচনা—ঘটনার বিশ্লেষণ নেই, কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা নেই। তাতে করে এগুলো বড়জোর সমাজের দর্পণের (পুরো নয়, আংশিক, সে অর্থে ভাঙা দর্পণের) কৃতিত্ব দাবি করতে পারে, কিন্তু আগামী দিনের সমাজ নির্মাণের কঠিন-কঠোর যুদ্ধের সৈনিক হবার ইচ্ছে পরিস্ফুট হয় না।

ষাটের দশকের এই পশ্চাদবর্তী চিন্তাভাবনা একটি রক্তাক্ত সশস্ত্র যুদ্ধের পরও কেমন করে টিকে গেলো তা বিশদ গবেষণার বিষয় নয়। শুধু একটি কারণেই তা সম্ভব হয়েছে, তা হলো মূল্যবোধের পরিবর্তনহীনতা। যে মূল্যবোধ ষাটের দশকে আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের ভেতরে প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলো আজো তা আছেঅপরিবর্তনীয়ভাবে।

কিন্তু আগামীতেও কি এই রকম ছাপা কাগজের স্তূপ জমে উঠবে, না কি এইসব ছাপা কাগজে আমাদের জনগোষ্ঠীর মতামত প্রতিফলিত হবে— এইসব সাময়িকপত্রগুলো আগামী সমাজ নির্মাণের যুদ্ধাস্ত্র হয়ে উঠবে তা ভেবে দেখার দরকার আছে।

।। তিন ।।

প্রচার মাধ্যম, যোগাযোগের মাধ্যম নয়

আমাদের বেতার সম্পর্কে দুর্জনেরা ব্যঙ্গ করে বলে 'ওতো শুধুমাত্র শোনার যন্ত্র'। আপাতত হয়তো ব্যঙ্গটা বোঝা যায় না কিন্তু ভেবে দেখলে এ নিয়ে দুঃখ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমাদের কথা বলা হলো কিনা এ নিয়ে অভিযোগ জানানোর কোনো উপায় নেই। কেননা ওতো শুধুমাত্রই শোনার যন্ত্র—একেবারেই একপক্ষীয় ব্যাপার। আমাদের বেতার সম্পর্কে এটি একটি মর্মান্তিক সত্য কথা।

দিনের প্রায় সবটাই জুড়ে এখন বেতারের অনুষ্ঠান চলে। একথা ঠিক যে, ঐ অনুষ্ঠানমালা আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহদংশের

www.pathagar.com

কাছে পৌঁছায়; কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানমালা কি তাদের আদৌ কোনো কাজে দেয়? হয়তো দেয় কিংবা দেয় না। অথচ আমাদের কর্তৃপক্ষ তার কোনো খোঁজ খবর রাখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। কিন্তু আমাদের মতো অনুন্নত দেশে এর চেয়ে বড় ও শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম আর একটিও নেই। যে দেশের শতকরা আশির অধিক ব্যক্তি পড়তে পারেন না, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা বিনোদনের উপকরণ মাত্র সে দেশে সঙ্গত কারণেই যোগাযোগের একমাত্র উপায় হচ্ছে বেতার—যে মাধ্যমটির সীমানা ছড়ানো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

অথচ সারাদিন জুড়ে গান, কথা আর পুরোনো খবর ছাড়া কি এমন প্রচার করে আমাদের বেতার? ওগুলোতে শিক্ষামূলক উপাদান কিছু থাকে বলে তো মনে হয় না। আর যদিওবা থেকে থাকে তাও উপস্থাপনার গুণপনায় ঐ চরিত্রটি হারিয়ে ফেলে। নেহাতই মনোরঞ্জন অথবা বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া ওতে আর কোনো ফল দেয় না। অথচ ঐ ভূমিকা পালনের জন্যে বেতার নয়, আরো অনেক কিছুই পৃথিবীতে আছে।

আমাদের বেতারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যেটি সেটি হচ্ছে তার এই একপক্ষীয়তার অভিযোগ। এক নাগাড়ে খবর পড়ার মতো সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হয়। ওগুলো জনগণের কাছে পৌঁছুচ্ছে কিনা, পৌঁছুলেও তাতে কি ফল হচ্ছে, কতটুকু হচ্ছে, যতটুকু আশা করা গিয়েছিলো তা অর্জিত হয়েছে কিনা এগুলো জরিপ করে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। আর সর্বোপরি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-দৈন্য তথা জনমত প্রতিফলনের গুরুদায়িত্ব পালন করা বোধকরি সহজসাধ্য। কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতারের একপক্ষীয় অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে একটি বিরাট প্রভাবশালী যোগাযোগ মাধ্যম অবলীলায় 'প্রচার মাধ্যমে' পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ যে মাধ্যমটি জনগণের সাথে জনগণের, জনগণের সাথে সরকারের যোগাযোগের দায়িত্ব নিতে পারতো তা শুধুমাত্রই প্রচারযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। জনগণকে শিক্ষিত করার দায়িত্বকে আমাদের বেতারের কর্তাব্যক্তিরা ভেবেছেন 'আদেশ দেবার অধিকার।' ফলে শিক্ষা কার্যক্রমের বদলে বেতারের অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে ঐশী বাণী। এই ঐশী বাণী জনগণের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, আর তা যে পারছে না সেটি জানাবার উপায়ও নেই—কেননা বেতার তো কেবলই শোনার যন্ত্র, প্রচার মাধ্যম—যোগাযোগের উপায় নয়।

বিনোদনের উপকরণ ও আগ্রাসনের হাতিয়ার

উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শহুরে ভদ্রলোকদের ড্রইং রুমের শোভা বর্ধনের জন্যে যেমন একটি টিভি সেট অত্যাবশ্যকীয় হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছে তেমনি দেশের শোভাবর্ধনের জন্যেই যেনো বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্ম ও লালন-পালন। আমাদের মতো গরিব দেশের জন্যে যা রীতিমতো শ্বেত-হস্তী পালনের বিলাসিতা—সোজা কথায় গরিবের ঘোড়ারোগ। সম্প্রতিককালে রঙিন টেলিভিশন চালু এই শ্বেত-হস্তীকে কৃত্রিমভাবে রঙিন করার মতোই মনে হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসূচী দেখলে যা মনে হয় তাতে একে বিনোদনের উপকরণ ছাড়া কর্তৃপক্ষ আর কিছু ভাবছেন বলে মনে করার কোনো যুক্তি পাই না। কেননা সপ্তাহের প্রচারিত সময়ের সর্বাধিক অংশই বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয়িত হয়ে থাকে—ঘণ্টার হিসেবে ২৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট (তথ্য সূত্র; নিরীক্ষা, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ৪২)। একেই তো উচ্চমূল্য, বিদ্যুতায়িত এলাকার সীমাবদ্ধতা ও গড়পড়তা মানুষের নিম্ন আয়ের কারণে ব্যাপক জনগণের কাছে টিভি এখনও বিলাসিতা। তদুপরি এই অনুষ্ঠানমালার বহর দেখে প্রমাণিত হয় অনুষ্ঠান পরিকল্পনার দীনতা এই মাধ্যমটিকে আরো বেশি সংকুচিত করে দিচ্ছে। উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তের ড্রইং রুমের শোভা বর্ধনের দায়িত্ব নেবার জন্য কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেবেন ঐ শ্রেণীভুক্তরা—কিন্তু আমরা যারা গণমাধ্যমের ভিন্ন ভূমিকা প্রত্যাশী—তাদের কাছে এটি লজ্জাজনকই বটে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে লাখ-লাখ টাকা খরচ করে অলিম্পিক বা আলী-বাগনার মুষ্টি-যুদ্ধ প্রহসন ছাড়াও যা প্রদর্শিত হয় তাতে ক্রাইম, সেক্স ও ভায়োলেন্স ছাড়া আর কিছু শিক্ষণীয় থাকে না। আর তাই দেখেই আজকে টেলিভিশনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হয়ে ওঠার অভিযোগ উঠেছে। টেলিভিশনে প্রতি সপ্তাহে ১৬ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট (তথ্য সূত্র ঃ ঐ) ধরে যে আমদানিকৃত ছবিগুলো দেখানো হয় তার সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের যোগসূত্র কোথায়? বরং আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির জন্য তা হয়ে উঠেছে হুমকি স্বরূপ। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের গণমাধ্যমগুলোকে সাম্রাজ্যবাদী চক্ররা যেভাবে সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে আমাদের টেলিভিশন তারই অনুসারী হয়েছে। রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের সাম্রাজ্যবাদের এই কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষিত করবার পরও আমাদের জাতীয় গণমাধ্যমটি কেনো এই বিকৃত মূল্যবোধের প্রচারক হবে—এর কোনো সদুত্তর আমরা পাই না। গণমাধ্যমের সক্রিয়তার (Effectiveness) জন্য স্থানিকতা (Localness) হচ্ছে এক অতি আবশ্যক শর্ত—টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাকারীরা অবলীলায় তা ভুলে গেছেন। বরং আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে টেলিভিশনের এই কর্মকাণ্ড দেখে বিস্মিত হতে হয়। আমদানিকৃত বিদেশী ছায়াছবির প্রদর্শন নিয়ে প্রশ্ন তুললে কর্তৃপক্ষ যে যুক্তিটি দেবেন তা হলো স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠান নির্মাণের চেয়ে বিদেশী

www.pathagar.com

ছবি আমদানি অনেক লাভজনক—আর্থিক বিবেচনায়। এটি নিশ্চয়ই সত্য ঘটনা। তৃতীয় বিশ্বের ছোটো ছোটো দেশের গণমাধ্যমগুলোর কাছে সাম্রাজ্যবাদী চক্র ছবি বিক্রির সময় এই 'অপার-উদারতা' যে দেখান তা আমরা ভালো করেই জানি। ১৯৫৮ সালের একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেই পাঠকেরা সহজে তা বুঝতে পারবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ঘণ্টার একটি টিভি ফিল্ম ফরাসী টেলিভিশনের কাছে বিক্রি করেছিলেন ৪৪০০ ডলারে আর ঐ একই ফিল্ম নিকারাগুয়ার কাছে বিক্রি করা হয়েছিলো মাত্র ৬০ ডলারে। কারণ কি? কারণ সহজবোধ্য ভাবেই সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার। প্রত্যক্ষ আগ্রাসন ও আধিপত্যের দিন অবসিত হওয়ার সাথে সাথে কৃৎকৌশলগত উন্নতির সূত্র ধরে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ভিন্ন রূপে গরিব দেশগুলোর ওপর পরিচালিত হচ্ছে—সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তারই একটি নমুনা। টেলিভিশনে মার্কিনী ছবির ছড়াছড়ি দেখে মনে হয় আমাদের টেলিভিশনের কর্তাব্যক্তিরা ঐসব ষড়যন্ত্রকারীদের পাতা ফাঁদে স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় পা দিয়ে ফেলেছেন; মিছরি ভেবে মিছরির ছুরির তলায় গলা পেতে দিয়েছেন।

গত ষোলো বছরে টিভির কর্তাব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড এমনি অস্পষ্ট ও কুহেলিকাচ্ছন্ন যে আদৌ তারা ঐ মাধ্যমটি পরিচালনায় যোগ্য কি না এ নিয়ে প্রশ্নও কেউ কেউ তুলছেন— অবশ্য সেটাও অতিরঞ্জন বৈকি! তবে এটা ঠিক যে, বাংলাদেশ টেলিভিশনের গত ষোলো বছরের কার্যক্রম আমাদেরকে এমন কিছুই উপহার দেয়নি যাতে করে আমরা তার প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা উপলব্ধি করতে পারি। জাতীয় উন্নয়নে টেলিভিশনের মতো গণমাধ্যমের কর্তব্য-কর্ম নিয়ে আর কিছুই বলতে চাই না। সবাই কমবেশি তা উপলব্ধি করতে পারেন। সেই মৌলিক প্রশ্নটি আদৌ টেলিভিশন সমাধান করতে পারলো না— এটাই দুঃখজনক।

সে প্রশ্নটি সমাধান না করে, জনগণের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে টেলিভিশনের যত বড় স্টুডিও তৈরি হোক, প্রচার-সীমার যতই বৃদ্ধি ঘটুক, যতগুলো চ্যানেলেই টিভি অনুষ্ঠান প্রচারিত হোক আর রঙের বাহারি ঢঙে টিভি যতই উজ্জ্বল হয়ে উঠুক না কেনো কোনো লাভ হবে না। তাই বাংলাদেশ টেলিভিশনের আজ যা দরকার তা বড় স্টুডিও নয়, নয় নতুন চ্যানেল বা মূল্যবান যন্ত্রপাতি, দরকার অনুষ্ঠান পরিকল্পনা-কারীদের জন্য প্রচুর মেধা, সৃজনশীলতা ও জনগণের চাহিদা সম্পর্কে স্ফটিক-স্বচ্ছ ধারণা এবং সর্বোপরি গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের ব্যবহারের পথ উদ্ভাবন। এর আগে কিছুতেই এই গণবিচ্ছিন্নতা মেটানো যাবে না।

মেধাহীন বাণিজ্যের উপায়

আমাদের চলচ্চিত্র তার সিকি শতাব্দী পার করেও যে অসহায়

www.pathagar.com

নাবালকত্বের অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে তা দেখে করুণা ছাড়া আমাদের আর কোনো অনুভূতিই জাগে না। সত্যি সত্যি এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এই পঁচিশ বছরে নির্মিত প্রায় পাঁচশো ছবিতে আমাদের চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রার বদলে প্রত্যক্ষ করি নৈরাশ্যজনক পশ্চাদযাত্রা। আমাদের চলচ্চিত্র এই পঁচিশ বছরে 'আর্ট' হিসেবে যেমন পিছিয়েছে 'ইণ্ডাস্ট্রি' হিসেবেও তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কেননা প্রায় গোড়া থেকেই আমাদের নির্মাতারা একে 'আর্ট ফর্ম' বা 'ইণ্ডাস্ট্রি' হিসেবে না ভেবে ভেবেছেন বিনোদন-মাধ্যম। আর বিনোদন-মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতে গিয়ে তাঁরা অবলীলায় ভুলে গেছেন গণযোগাযোগ-মাধ্যম হিসেবে এর তাৎপর্য কতটুকু। তারই ফলে পরবর্তী কালে আপোস করতে গিয়ে তাঁদের বিনোদন সস্তা, চটুল ও রুচিহীনতারই স্বাক্ষর রেখেছে।

চলচ্চিত্রের প্রথম দশকে (১৯৫৬-৬৫) তবু চলচ্চিত্র বিবেচিত হতো একটি সুস্থ, সুন্দর, রুচিশীল বিনোদন-মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু দ্বিতীয় দশকের (১৯৬৬-৭৫) প্রধান প্রবণতা তা থেকে সরে এসে দাঁড়িয়েছে বাণিজ্যের সরল রাস্তায়। আর তাই আলু, পটল, মরিচের ব্যবসার রীতি প্রক্রিয়া অবলীলায় চলচ্চিত্রকে আক্রমণ করেছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি তথ্যে যে, ১৯৬৬-তে বাংলাদেশে তৈরি ২৬টি ছবির মধ্যে বাংলা ছবির সংখ্যা ১৪ এবং তৎকালীন সরল ব্যবসার পথ উর্দু ছবির সংখ্যা ১২। আর ১৯৭২-৭৭ সালকে তো অবলীলায় 'নকল ছবির কাল' বলেই চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু এর কারণ কি ? এই প্রশ্ন যদি কেউ তোলেন তবে খুব সহজেই তার উত্তর দেয়া যায়।

তা হলো উদ্দেশ্যহীনতা। আমাদের চলচ্চিত্রের মৌলিক সমস্যাই হচ্ছে আদর্শহীনতার সমস্যা। আমাদের চলচ্চিত্র-নির্মাতারা নিজেরাই জানেন না কি করবেন, কেনো করবেন, কার জন্য করবেন। যদি এই কি কেনো'র উত্তরগুলো নির্মাতারা খুঁজতে চান, চেষ্টা করেন তবেই তাঁদের সামনে পথ ও পদ্ধতি উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

সব মিলিয়ে এই হচেছ আমাদের গণ-মাধ্যমগুলোর অবস্থা। সমস্যা ও সম্ভাবনা— উভয়ই তার উপস্থিতির কথা সরবে ঘোষণা করছে।

গণবিচ্ছিন্ন বিবরবাসের এই অন্ধকার অমানিশার শেষে আলোময় ভোরের প্রত্যাশা আমাদের সবার মধ্যেই তীব্র হয়ে উঠছে। আর তাই আশা করি সেই ভোর খুব দূরে নয়— আমাদের গণমাধ্যমগুলো যথার্থ অর্থে গণমাধ্যম হয়ে উঠবে, দিন বোধকরি অতি কাছেই।

রচনাকাল ঃ ১৯৮১

www.pathagar.com

স্বাধীনতা-উত্তর সাংবাদিকতা

বাংলাদেশ যে সময়টিতে স্বাধীনতা লাভ করে সে সময়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা পেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ সময়। অবিভক্ত বাংলার হিসেব ধরলে সেই কাল-পরিধি ১৯১ বছর[১], সুস্পষ্ট সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে দেখলে তার সীমা দাঁড়াবে ১৫৩ বছর[২]। দৃষ্টি-সীমাকে যদি আরো সংকুচিত করে আজকের বাংলাদেশ বলে পরিচিত ভূখণ্ডে স্থাপন করি তবে তার কাল সীমা দাঁড়াবে ১২৩ বছর[৩]। শতাধিক বছরের এই দীর্ঘ সময়ের ঐতিহ্যকে ধারণ করেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু হয়েছিলো। এই সূচনা-কালে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা কেবল যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসেরই উত্তরাধিকার হয়েছিল তা নয়, একই সঙ্গে তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চিত ছিলো নানাবিধ প্রতিবন্ধের কাহিনী। কিন্তু সেটাও সব নয়। সর্বোপরি একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ ও তার পটভূমিকা হিসেবে ২৩ বছরের আপোসহীন সংগ্রাম গোটা জাতিকেই আশায় উজ্জীবিত করে রেখেছিলো। সদ্য-স্বাধীন একটি দেশে সর্বক্ষেত্রে জাগরণের নতুনতর প্রত্যাশায় বেগবান হয়ে ওঠার যে স্বাভাবিক ধারা সে তো ছিলোই, উপরন্তু ছিলো সর্বস্তরের

এই পটভূমিকায়ই বাংলাদেশের সাংবাদিকতার সূচনা হয়।

পটভূমি বিস্তৃত—সমস্যা ও সম্ভাবনা উভয়ই ব্যাপক। নিঃসন্দেহে এটা যেমন মনে রাখা জরুরী যে, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়েই আমরা নতুন করে শুরু করবার সুযোগ পেয়েছিলাম; তেমনি এটাও গুরুত্বের সাথে স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, ঐ ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ সবকিছুকেই যাদুর স্পর্শে পাল্টে দেয়নি। ফলে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনামলে যে সকল বৈশিষ্ট্য সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলো তাও উত্তরাধিকার-সূত্রে বাংলাদেশের সাংবাদিকতাকে ধারণ করতে হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমত পরিমাণগত; দ্বিতীয়ত মানগত। পরিমাণের দিক থেকে, স্বাধীনতা লাভের পরের মুহূর্তেই, সংবাদপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এমন ভাবা যৌক্তিক নয়—বিশেষত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ফলে গোটা দেশের অর্থনীতিই যখন ভেঙ্গে পড়ার মুখোমুখি সে সময় তো সেটা একেবারেই অসম্ভব। পাকিস্তানী আমলের সর্বশেষ যে পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত মোট দৈনিকের সংখ্যা ২৫টি, অর্ধ সাপ্তাহিক ৩টি এবং সাপ্তাহিক ১০২টি। এই সংখ্যা ১৯৬৯-এর তুলনায় বেশি। '৬৯-এ দৈনিকের সংখ্যা ছিলো ২১টি, অর্ধ-সাপ্তাহিক ২টি এবং সাপ্তাহিকের সংখ্যা

www.pathagar.com

৬৮টি।[৪] মুক্তিযুদ্ধকালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো বটে, তবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সে সকল প্রকাশনাকে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা যথাযথ নয়। স্বাধীনতার সাথে সাথেই এই পরিমাণ বেড়েছে এমন নয়, তবে স্বাধীনতা লাভের এক বছর পর সে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছিলো।

স্বাধীনতা-পূর্বকালের সাংবাদিকতার মানগত অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা অসম্ভব। পরিমাণগত অবস্থা নির্ণয়ে যেমন নির্ধারিত সূচক রয়েছে মানের তেমন নেই। তবে গোটা পরিস্থিতি বোঝার জন্যে আমরা কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করবো। স্বাধীনতা-পূর্বকালের, বিশেষত স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখযোগ্য তা হলো তার পরাধীনতা।

গোটা জাতিই যেখানে শৃঙ্খলিত সেখানে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা স্বাধীন থাকবে—এমন প্রত্যাশা আমরা করছি না। তবে সাংবাদিকতার ওপরে যে সকল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা ১৯৭০ সালেও বহাল ছিলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সামরিক আইনের ৬ নং, ১৭ নং ও ১৯ নং বিধি।[৫] এর সাথে যুক্ত হয় ১৯৭১ সালের মার্চে ১১০ নং সামরিক আইন বিধি।[৬] এগুলোকে যদি আপৎকালীন জরুরী ব্যবস্থা বলেও বিবেচনা করি তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যে চালু ছিলো প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স ১৯৬০। এ সমস্ত বিধি-বিধানই সাংবাদিকতাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় সম্পূর্ণ বন্দী করে রেখেছিলো। ফলে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের এবং এমনকি সত্য ঘটনা প্রকাশেরও কোনো সুযোগ সংবাদপত্রগুলোর ছিলো না। এই প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন প্রদানে বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্য দিয়েও সংবাদপত্রকে করতলগত রাখতে সরকার বারবার প্রয়াসী হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বিত হয়েছে ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে মালিকের ইচ্ছের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলেও। ১৯৬৪ সালে প্রেস ট্রাস্ট গঠনের পর ঐ ট্রাস্টের অধীন সংবাদপত্রগুলোর কণ্ঠস্বরে যে নতজানু মানসিকতার প্রকাশ তাও ঐ স্বাধীনতাহীনতারই প্রকাশ। মোট কথা সাংবাদিকতায় স্বাধীনতা লুণ্ঠিত ও পদদলিত হচ্ছিলো পাকিস্তানী আমলে। সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ আরোপের ঘটনা ঘটেছে অসংখ্যবার, সাংবাদিকরা লাঞ্ছিতও হয়েছেন বহুভাবে।

স্বাধীনতা-পূর্বকালের সাংবাদিকতার অন্য আরেকটি চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তা শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ভিন্ন আর কিছুই হতে পারেনি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাঙলার যে বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিলো সংবাদপত্রের মালিকানাও ছিলো এদেরই হাতে। ষাটের দশকের পূর্ব পর্যন্ত যে বাংলাদেশে যথাযথ নগরই গড়ে ওঠেনি সেখানেও সংবাদপত্রগুলো নগরীর বাইরের সংবাদকে বিবেচনা

www.pathagar.com

করতো 'মফস্বল সংবাদ' বলে এবং এর জন্যে বরাদ্দ থাকতো সংবাদপত্রগুলোর ভেতরের পাতা। নগরীর বাইরের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও নগরীর গুরুত্বহীন সংবাদের কাছে পরাজিত হতো। এটি কেবল একটি বা দু'টি সংবাদপত্রের বিষয়ই নয়, সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যে মধ্যবিত্তের প্রতাপ বিরাজমান ছিলো তারই প্রমাণবহ।

পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা স্বাধীনতা-পূর্বকালে বিকশিত তো হয়ই নি, সমাজে গ্রহণযোগ্যও ছিলো না। এর অবশ্য একটি প্রধান কারণ ছিলো এই যে, সংবাদপত্র তখন শিল্প (industry) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। শিল্প হিসেবে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা না-হওয়া যেমন সাংবাদিকতা-পেশার বিকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছিলো ঠিক একইভাবে সংবাদপত্রের শিল্প হিসেবে বিকাশ রুদ্ধ হয়েছিলো পূর্ববঙ্গে অপরাপর শিল্প বিকশিত না হওয়ার কারণে। যে দেশে শতকরা অনধিক ২০ ভাগ লোক শিক্ষিত সে দেশে সংবাদপত্র কেবল পাঠকের ওপর নির্ভর করে প্রকাশিত হতে পারে না, নির্ভর করতে হয় বিজ্ঞাপনের ওপরই। ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প গড়ে ওঠেনি যার বিজ্ঞাপনের ওপরে নির্ভর করা যায়। নির্ভর করতে হতো, স্বাভাবিক কারণেই, সরকারী বিজ্ঞাপনের ওপরে। তাও আবার পাওয়া না পাওয়া নির্ধারিত হতো সংবাদপত্রের সরকার সমর্থন বা বিরোধিতা দ্বারা। এসব কিছুই এতো অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলো যে সংবাদপত্রের বিকাশের প্রশ্নটি পূর্ববঙ্গের রাজনীতির ভবিষ্যতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছিলো। ঢাকায় প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপনের (১৮৫৯ সালে) —শতাধিক বছর পর ষাটের দশকের মধ্যভাগে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্রের (অফসেট মেশিন) আমদানি হয় বটে, কিন্তু তাতে সংবাদপত্রের প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। কেননা সে সময়টিতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ওপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিলো তাতে করে সংবাদপত্রের প্রকাশনা ছিলো প্রায় অসম্ভব।

স্বাধীনতা পূর্বকালের সাংবাদিকতার আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এখানে আবশ্যক, এর মধ্যে দক্ষতার অভাব ও কারিগরি সুযোগের স্বল্পতা অন্যতম। এ সব সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাবনারও একটি দিক ছিলো। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তির যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিলো এ দেশের সংবাদপত্রগুলো তাতে নিজ নিজ ভূমিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে দুটো স্রোতধারায় বিভক্ত হয়ে যেতে থাকে এবং ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে তা অত্যন্ত স্পষ্টরূপ লাভ করে। সংবাদপত্রের ও সাংবাদিকতার রাজনৈতিক ভূমিকা এ সময় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার দাবিও প্রাধান্য পেতে থাকে।

এর পরই আসে মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তুরের ৯টি মাস একদিকে

www.pathagar.com

অবরুদ্ধ সংবাদপত্র, অন্যদিকে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র উভয় সাংবাদি-কতার নীতিমালার বাইরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। মান ও পরিমাণ নির্ণয়ের সময় বা সুযোগ সেটি নয়।

স্বাধীনতা-লাভের পর গোটা পরিস্থিতিটিই পাল্টে যায়। প্রাতিভাসিক-ভাবে তো অবশ্যই। সাংবাদিকতার নিকট-প্রতিবন্ধ সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা লাভের তিনমাসের মধ্যেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন ঃ The Government of Bangladesh was aimed at estabilishing a free and responsible press[১০]

সরকার-প্রধানের এই উক্তিই শুধু নয় স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ হিসেবে জাগ্রত বাংলাদেশে ন্যূনতম গণতন্ত্র থাকবে এই প্রত্যাশা থেকে সে সময়ে সংবাদপত্রের কাছে যা চাওয়া হয়েছিলো তা এই রকম ঃ First, a truthfull comprehensive, and intelligent account of the day's events in a content which gives them meaning; second, a forum for the exchange of comment and criticism; third, a means of projecting the opinions and attitudes of the groups in the society to one another ; fourth, a method of presenting and clarifying the goals and values of the society; and fifth, a way of reading every number of the society by the currents of information, thought and feeling which the press supplies''.[১১]

কিন্তু সত্য হলো এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশে এই ভূমিকা পালনে প্রথম প্রতিবন্ধ সৃষ্টি হলো সরকারের কাছ থেকেই। সরকার প্রধান যখন বললেন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের কথা তখনই কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো ১৯৬০ সালের প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স, সরকার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন ৪টি সংবাদপত্র। ১৫ই মার্চের লেখা সম্পাদকীয়ের (The Supreme Test) জন্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত 'বাংলাদেশ অবজারভার' থেকে অপসারিত হলেন সম্পাদক আবদুস সালাম। এই ঘটনা ছিলো কেবলমাত্রই সূচনা। ১৯৭২ সালের জুলাই'র আগেই সাপ্তাহিক হক কথার ও গণশক্তি নিষিদ্ধ হয়, হক কথায় সম্পাদক গ্রেফতার হন, গণশক্তির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হাবিবুর রহমানের নামে হুলিয়া জারি হয়।[১২] পরবর্তী বছরের প্রথম দিনেই সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক বাংলা থেকে সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান ও প্রকাশক তোয়াব খান অপসারিত হন সত্য ঘটনা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশের দায়ে। ১৯৭৩ এর মার্চে সরকার বিরোধী সংবাদপত্র 'গণকণ্ঠ' বন্ধ করে দেন সরকার। জুলাইয়ের আগেই দেখা যায় পাঁচটি পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিয়েছেন,[১৩] দু'জন সম্পাদক গ্রেফতার হয়েছেন,[১৪] একজন প্রকাশকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছে।[১৫]

www.pathagar.com

আর কজন সম্পাদক তখনও কারারুদ্ধ।[১৬] আগস্ট মাসে চট্টগ্রামের 'দেশবাংলা' পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে বার্তা সম্পাদকসহ ৯ জন গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৪ সালে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার উপরে হামলা কেবল তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সমর্থক 'গণকণ্ঠ'– এর ঘটনা থেকেই স্পষ্ট[১৭], 'হলিডে'র ৪ মাসের (জুন–সেপ্টেম্বর) সব সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করার এবং ডিক্লারেশন বাতিলের ঘটনা পুরো পরিস্থিতি বুঝতে সহায়ক হবে। সরকারী নিয়ন্ত্রণের সংবাদপত্রের হাল অবস্থা আবদুস সালাম ও হাসান হাফিজুর রহমানের অপসারণেই পরিষ্কার, অতিরিক্ত বোঝার জন্যে ১৯৭৪–এ পূর্বদেশ থেকে বার্তা সম্পাদক মীর নূরুল ইসলামের অপসারণের কথাও মনে করা যেতে পারে। ১৯৭৪–এ পুলিশী হয়রানীর শিকার হয় 'অভিমত' সম্পাদক আলী আশরাফ, ১৯৭৫ সালে গ্রেফতার হন 'হলিডে' সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান।[১৮] ইতোমধ্যে ১৯৬০–এর প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স এর বদলে ১৯৭৩ সালে জারি হয় মুদ্রণ ও প্রকাশনা আইন যাকে একটি সংবাদপত্র বর্ণনা করেছে 'সংবাদপত্র প্রকাশে জন্মনিরোধ বটিকা' বলে,[১৯] কেননা এ সময়ে সরকারী হিসেবেই ১০৮টি কাগজ হয় 'সিজড' হয়েছে, নতুবা সাসপেণ্ড।[২০]

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে লেশমাত্র অবশেষ বিরাজ করছিলো তাও ধূলিস্যাৎ হয়। অনিবার্যভাবেই সাংবাদি–কতার ওপরেও এসে পড়ে তার প্রভাব। ভিন্নমতের প্রকাশ বৈধ পন্থায়ই অবৈধ বলে চিহ্নিত হয়। এটা আরো বৈধ হয়ে উঠে ১৬ই জুন তারিখে। ৪টা দৈনিকসহ কয়েকটি সংবাদপত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে ২২২টি সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে গোটা জাতি যে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার জন্যে লড়াই করেছিলো তা যেমন একদলীয় ব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে নিহত হলো, তেমনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পদদলিত ও লুণ্ঠিত হলো এই ঘোষণায়। এ ঘটনাবলীর তাৎপর্য এইখানেই যে, স্বাধীনতা–উত্তরকালের সাংবাদিকতার প্রথম চার বছরের মধ্যে উপর্যুপরি হামলা গোটা সাংবাদিকতার মেরুদণ্ডটিকেই ভেঙ্গে দিয়েছে। পরবর্তীকালে পঁচাত্তরের রাষ্ট্রীয় পট–পরিবর্তনের পর সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়ার ঘটনা বিরাশির সামরিক শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত বিরল; সম্পাদকদের হয়রানি হবার ঘটনাও সহজ–দৃস্ট নয়। কেননা এই দু'য়ের কোনটারই প্রয়োজন দেখা দেয়নি। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, গ্রেফতার, হামলা হয়রানির পরিবর্তে সরকারী তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধস্তন কর্মচারীর টেলিফোনই যথেস্ট পরিমাণে ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে— সংবাদপত্র মালিক, সম্পাদক ও

www.pathagar.com

সাংবাদিকরা সাংবাদিকতার সাহসী নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত নন, হতেও পারেন না। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর সাংবাদিকতার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে যদি কোনকিছুকে উল্লেখ করতে হয় তবে তা নিঃসন্দেহে 'সংবাদপত্রের পরাধীনতা ও সাংবাদিকের নতজানু ভঙ্গি'।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাংবাদিকরা যে বন্দী, সংবাদপত্র যে পরাধীন এবং সাংবাদিকরা যে নতজানু তার কারণ কেবল এই নয় যে, সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করেছেন। তার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা প্রেস-ফ্রিডমের ধারণাই আমাদের সাংবাদিকতা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে স্পষ্ট নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সাংবাদিকের স্বাধীনতা না সংবাদপত্র মালিকের স্বাধীনতা নাকি সংবাদপত্রের সকল মতের অবিকৃত প্রকাশ তা এখনো মীমাংসিত হয়নি। তবে মূল সমস্যাটি সেখানেও নয় বলে আমার ধারণা। গোটা সমাজে পুঁজির একচ্ছত্র আধিপত্যই বারংবার সাংবাদিকতার অবাধ বিকাশকে রুদ্ধ করছে। মুনাফালোভী পুঁজি নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ীই সংবাদপত্র ও স্বাধীনতাকে মুনাফার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে, সকলের তথ্য জানার অধিকার স্বীকৃত না হয়ে তথ্য হয়ে উঠেছে পণ্য। সাংবাদিকতা শ্রম হিসেবে পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও সাংবাদিকের স্বাধীনতার প্রশ্নে দেখা দিচ্ছে বিভ্রান্তি।[২১] স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা যত সংহত হচ্ছে সাংবাদিকতার ওপরে নিয়ন্ত্রণ আরো জোরদার হচ্ছে, সাংবাদিকতার সাহসী চরিত্র ততই খর্ব হচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে জোরদার পাহারাদার সামরিক আইন জারির (১৯৮২) পর এই ধরনের হামলা ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি থেকেও এটা বোঝা যায়।

পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেবল বাইরে থেকেই সাংবাদিকতার ওপরে হামলা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেনি একই সঙ্গে তা ভেতর থেকেও সাংবাদিকতার ওপরে খবরদারির ব্যবস্থা করেছে যার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে শিল্প হিসেবে সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা উত্তরকালে, বিশেষত মধ্য-সত্তুরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সংবাদপত্র একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প হয়ে উঠেছে। এতে পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা গ্রহণযোগ্য ও সামাজিকভাবে সম্মানিত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু পুঁজির নিজস্ব নিয়ম সাংবাদি-কতার বিকাশে প্রতিবন্ধ রচনা করছে। সাংবাদিকতায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কারিগরি অসুবিধাসমূহ দূরীভূত হয়ে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এসব কিছু সত্ত্বেও স্বাধীনতা-পুর্বকালের মতোই স্বাধীনতা-উত্তরকালের সাংবাদিকতা স্বদেশে প্রবাসী। সাংবাদিকতার প্রবাস জীবন এখন আরো বেশি স্পষ্ট ও আশঙ্কাজনক। স্বাধীনতা-

www.pathagar.com

পূর্বকালের সাংবাদিকতা নগরাশ্রয়ী ছিলো—গ্রামগুলো, মফস্বলের শহরগুলো ছিলো তাদের কাছে অপাংক্তেয়।[২২] আজকে, আশির দশকের সূচনাপর্বে, আমাদের সংবাদপত্রগুলোর অধিকাংশই বাহন হয়ে উঠেছে বিদেশী সংবাদের। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীন একমুখী তথ্যস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তার খপ্পরে পড়ে আমাদের সংবাদপত্রগুলো স্বদেশী সংবাদের চেয়ে বিদেশী সংবাদকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। শহুরবাসী মধ্যবিত্তের উদ্বাস্তু মানসিকতাই কেবল এর জন্যে দায়ী নয়, সাংস্কৃতিক উপনিবেশ সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রও এর পেছনে ক্রিয়াশীল। তথ্য সাম্রাজ্যবাদের রাহুমুক্ত হয়ে থাকার বদলে তার করতলগত হয়ে পড়ছে সংবাদপত্রগুলো। এতে করে সংবাদপত্রের আয়নায় গোটা সমাজকে দেখতে পাবার প্রত্যাশা আর পূর্ণ হয় না।

মানের দিক থেকে বহুবিধ সমস্যাকে মোকাবেলা করেছে সাংবাদিকতা। তবে পরিমাণের দিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা স্বাধীনতা উত্তরকালে বৃদ্ধি পেয়েছে। '৭৫ সালের ১৬ই জুন পর্যন্ত প্রকাশনা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। পঁচাত্তরের ১৬ই জুনের ঘোষণা গোটা পরিস্থিতিকেই পাল্টে দেয়। সে অবস্থা আর ১৫ই আগস্টের পটপরিবর্তনের পর অব্যাহত থাকেনি। '৭৬ সালে এসে নতুন করে তার যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮২ সাল পর্যন্ত যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে স্পষ্ট যে, এই সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধিমান।[২৩] প্রকাশনার এই হিসেব নীচের সারণীতে বিধৃত ঃ

সাল	দৈনিক	অর্ধ সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিক
১৯৭২	৩০	৩	১৫১
১৯৭৩	৩৫	২	১৫৩
১৯৭৪	৩৩	২	১৫২
১৯৭৫ (১৬ই জুনের আগে)	৩৩	২	১৫৫
১৯৭৫ (১৬ই জুনের পর)	৬	০	২৬
১৯৭৬	১৭	০	৬৪
১৯৭৭	২৮	১	৯৬
১৯৭৮	৩১	১	১১৯
১৯৭৯	৪০	২	১২৮
১৯৮০	৪৪	২	১৫০
১৯৮১	৫৩	২	২০৬
১৯৮২	৫৩	২	১৬২

www.pathagar.com

স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাংলাদেশের সাংবাদিকতার গুণগত ও সংবাদপত্র প্রকাশনার পরিমাণগত দিকের এই পরিসংখ্যানকে পাশাপাশি রাখলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সাংবাদিকতা স্থির বিন্দুতে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। সামগ্রিক আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে সংকট তা অনিবার্যভাবে সাংবাদিকতার ওপরে প্রভাব ফেলেছে। ফলে এর বিকাশ ও বিস্তৃতি, পশ্চাদপদ পুঁজিবাদী আর্থ-ব্যবস্থায় যতটুকু সম্ভব তার সবটুকু অর্জিত না হলেও, সে পথেই অগ্রসর হচ্ছে। সংবাদপত্রের পরাধীনতা, সাংবাদিকের নতজানু ভঙ্গি, বিষয়বস্তুর নিরিখে সংবাদপত্রের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শহর নির্ভরতা এবং বিদেশী সংবাদের প্রতি পক্ষপাত আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহের মালিক গোষ্ঠীর শ্রেণী চরিত্র দ্বারাই নির্ধারিত। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছে সেখানে নেহাতই গৌণ।

তেরো বছরের বাংলাদেশের সাংবাদিকতার এই সংক্ষিপ্ত চিত্র হয়তো সাংবাদিকতার প্রধান প্রবণতাসমূহের তেমন স্পষ্ট ধারণা দিতে সক্ষম হবে না; তবে এটা ঠিক যে, গত তেরো বছরে আমাদের সাংবাদিকতা তেমন গৌরবজনক অধ্যায় রচনা করেছে—এমন দাবি করারও জায়গা নেই।

তবু আমরা আশাবাদী। কেননা এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার যে নিজস্ব সংকট, সংবাদপত্রগুলো তা তুলে না ধরলেও, তা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সেই সংকট থেকে মুক্তির পথ নিশ্চয়ই এদেশের কোটি কোটি মানুষ খুঁজে পাবেন। সাংবাদিকতাও তখন সংকটমুক্ত ও স্বাধীন চরিত্রে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তথ্যপঞ্জি

১. অবিভক্ত বাংলাদেশই শুধু নয় এই উপমহাদেশেরই প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র জেমস অগাসটাস হিকি'র 'বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার'। সেটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি, কলকাতা থেকে।

২. জেমস সিল্ক বাকিংহাম প্রকাশিত 'ক্যালকাটা জার্ণাল'কেই গবেষকরা সুস্থ সাংবাদিকতার প্রথম মাইলস্টোন হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালে,

৩. পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন যে সংবাদপত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো ''রঙ্গপুর বার্তাবহ''। ১৮৪৭ সালে রংপুর থেকে সাপ্তাহিক হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

৪. তথ্য সূত্র ঃ 'বাংলাদেশে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ঃ সংবাদপত্রসমূহ' শীর্ষক গবেষণা। গবেষক ঃ শ্রী সুব্রত শংকর ধর। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষ)।

৫. ২৫শে মার্চ '৬৯ সালে সামরিক আইন জারির পর ২৬শে মার্চ ৬নং সামরিক আইন বিধিতে বলা হয় সামরিক আইনের লিখিত বা মৌখিক, আকার, ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য সমালোচনা ইত্যাদির জন্যে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হবে। ১৭ নং সামরিক আইন বিধিতে বলা হচ্ছে ঃ ''যদি কোনো ব্যক্তি কথাবার্তায় অথবা লিখিত বা আভাসে ইঙ্গিতে বা অন্য যে কোনো পন্থায় এমন খবর ছড়ায় যাহার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক বা হতাশার সৃষ্টি হয় বা সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বা উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, তবে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।'' ১৯নং সামরিক আইন বিধিতে বলা হচ্ছে ঃ ''যদি কেহ মুখের কথায়, লেখার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক, এবং ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানের আঞ্চলিক বা শাসন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে খবর, গুজব অথবা সংবাদ প্রচার করিবে, তাহাকে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হইবে।''

৬. ''পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমুহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।''

৭. উনিশ শো সত্তুর সালে জনাব সাখাওয়াত আলী খানের এক গবেষণামূলক নিবন্ধে দেখা যাচ্ছে যে, একটি প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী দৈনিকে (দি পাকিস্তান অবজারভার) তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) মোট ১৪৪০টি মফস্বল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম পাতায় 'প্রথম লীড' বা 'দ্বিতীয় লীড'-এর মর্যাদা পেয়েছে মাত্র ৮টি সংবাদ, শতকরা হিসাবে মাত্র ০ দশমিক ৫৫। এ সময়ের অন্যতম একটি বাংলা দৈনিকে (দৈনিক পাকিস্তান) মফস্বল সংবাদের সংখ্যা ১১৪১টি, প্রথম/দ্বিতীয় লীডের সংখ্যা ১৪, শতকরা হার ১ দশমিক ২২। মোট মুদ্রণ এলাকার হিসেবে ইংরেজী দৈনিকটি মফস্বল খবরের জন্যে জায়গা ছেড়েছে শতকরা ৬ দশমিক ৬৫ ভাগ ঃ বাংলা দৈনিকটি ৯ দশমিক ৪২ ভাগ ঃ (তেথ্য

www.pathagar.com

সূত্র ঃ বাংলাদেশে মফস্বল সাংবাদিকতার সমস্যা ও সম্ভাবনা/মোঃ জিয়াউর রহমান ও অন্যান্য, জ্যোতিঃ, সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢা,বি,-র প্রকাশনা ১৯৮৪)

৮. তথ্য সূত্র ঃ শ্রীমদ যোগাশ্রমী পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য সম্পাদিত ‘‘বাংলার পারিবারিক ইতিহাস’’ গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড (সুব্রত শংকরের গবেষণায় উদ্ধৃত)। ঢাকার বাবুবাজারে স্থাপিত এই মুদ্রণ যন্ত্রের নাম ছিলো ‘‘বাংলা যন্ত্র’’।

৯. এ কথাটির অর্থ এই নয় যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিলে সব সময়ই সাংবাদিকতার নীতি লঙ্ঘিত হবে। একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধকালে জরুরী পরিস্থিতিতে ঘটনা ঘটেছিলো এই রকম যে, অবরুদ্ধ সংবাদপত্রগুলো দখলদারবাহিনীর করতলগত হয় এবং সম্ভাব্য সকল ধরনের মিথ্যা প্রচারণার বাহনে রূপান্তরিত হয়; অন্যপক্ষে মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলো বেরুতো মুক্তিযোদ্ধা ও অবরুদ্ধ স্বদেশবাসীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে। সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর।

১০. Bangladesh Observer, March 3,72

১১. Challenge & Stagnation ; The Indian Mass Media; Chanchal Sarkar: Vikas Publications, New Delhi, 1969, p.39

১২. সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ১৯৭২-৭৩/শুভ রহমান, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন।

১৩. পত্রিকাগুলো হচ্ছে ঃ স্পোকসম্যান, মুখপত্র, লাল পতাকা, ইত্তেহাদ ও নয়াযুগ।

১৪. মুখপত্র ও নয়াযুগের সম্পাদক।

রচনাকাল ঃ ১৯৮৪

www.pathagar.com

তথ্য সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলাদেশ

গ্রীক পুরাণের অসামান্য চরিত্র রাজা মিডাস জীবনের এক পর্যায়ে এসে যা স্পর্শ করতেন তাই হয়ে উঠতো স্বর্ণপিণ্ড। পুরাণের এই চরিত্রটিকে আমরা বাস্তবে আবিষ্কার করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যৎকিঞ্চিত ভিন্ন রূপে, পুরাণের শরীরী-রাজা বাস্তবে এসে রূপ নেয় অশরীরী 'পুঁজি'তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একচেটিয়া পুঁজিবাদ রাজা মিডাসের মতোই অভাবনীয় ক্ষমতা নিয়ে আবির্ভূত হয়, একচেটিয়া পুঁজি যা-কিছুকেই স্পর্শ করুক না কেনো বস্তু কিংবা নির্বস্তুতাই রূপান্তরিত হতে শুরু করে পণ্যে। আর পণ্য জলের নিম্নাভিমুখী গতির মতোই ছুটতে থাকে মুনাফার দিকে। মুনাফা খুঁজতে থাকে বাজার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যখন একচেটিয়া পুঁজি মুনাফার সন্ধানে বাজারকে সম্প্রসারিত করতে উন্মাদ-প্রতিম হয়ে উঠলো সেই সময়টিতে গোটা বিশ্বে ঘটতে শুরু করলো আরেকটি ঘটনা। তা হলো উপনিবেশের অবসান। দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির যে অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিলো পূর্ববর্তী বছরগুলোতে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অবসিত হতে শুরু করলো। জেগে উঠতে লাগলো নতুন নতুন স্বাধীন ভূখন্ড। সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশগুলো অর্থনৈতিক সংকটে ক্লিষ্ট, কিন্তু জাতীয় মুক্তির আস্বাদ লাভের ফলে ও ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত যে তাদের অনুন্নতি ও দারিদ্র্যের কারণ ঐ ঔপনিবেশিক শক্তি। ফলে ঠিক সেই সময়টিতে একচেটিয়া পুঁজির জন্যে তাদের সদর দরজা উন্মুক্ত করবার কোনো আগ্রহই তাদের থাকলো না।

কিন্তু পুঁজি বিশেষত একচেটিয়া পুঁজি তখন বাজার চায়, চায় ছড়িয়ে পড়তে গোটা বিশ্বে। সেই পটভূমিকায় পুঁজি-মালিকদের প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে প্রবেশের জন্য ভিন্ন পথের সন্ধান করতে হলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংকট তাদেরকে সেই পথও করে দিলো সহজেই। পুঁজি প্রবেশের সেই নতুন দরজার নাম হলো ঃ সাহায্য ও ঋণ। অর্থনৈতিক সাহায্য ও দীর্ঘ/স্বল্প মেয়াদী ঋণের আকারে ঔপনিবেশিক শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্যগ্রাসীদের অগ্রযাত্রা শুরু হলো স্বাধীন-ভূখন্ডে। ঔপনি-

www.pathagar.com

বেশিক যুগের অবসান হলো বটে, কিন্তু সূচনা হলো নয়া-ঔপনিবেশিক যুগের।

সাহায্য ও ঋণের প্রবেশদ্বার দিয়ে অনুপ্রবেশকারী সাম্রাজ্যবাদ কেবল আপাতপ্রবেশেই সন্তুষ্ট হয়নি। এই আধিপত্য যেন চূর্ণ না হয়, যেনো ভবিষ্যতে স্বাধীন জাতির ভেতর থেকে এই শোষণের বিরুদ্ধে নতুন চেতনা জাগ্রত না হয় সেইজন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়লো মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল চাপিয়ে দেয়ার, মনোজগতে উপনিবেশ স্থাপনের। দীর্ঘস্থায়ী শোষণের এই উদ্দেশ্য নিয়ে মানসিক দাসত্বের বন্ধন সৃষ্টির জন্যে শুরু হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। সেই আগ্রাসনের জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকলো সকল ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটতে থাকলো এই লক্ষ্যে। এমনকি নির্বস্তু তথ্য পর্যন্ত হয়ে উঠলো সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের হাতিয়ার। সৃষ্টি হলো তথ্য সাম্রাজ্যবাদের। যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়ে আজ যা রূপ নিয়েছে 'যোগাযোগ সাম্রাজ্যবাদ'-এ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বললে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৪০ বছর পরে গোটা বিশ্ব ঠেলে দেয়া হয়েছে এক অসম মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে, যে লড়াইয়ের একদিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নেতৃত্বে গুটিকয় ধনী দেশ যাদের করতলে বন্দী যোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিকতম উপকরণ- সমূহ, অন্যদিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার স্বল্পোন্নত দেশসমূহ। সুস্পষ্ট দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত এই আগ্রাসী যুদ্ধ-তৎপরতা। প্রথমত পুঁজিবাদী অর্থনীতির অপরাপর শাখার মতোই গণমাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে নৃশংসভাবে শোষণের মাধ্যমে নব্য স্বাধীন দেশগুলোকে আদর্শিকভাবে অধীন রাখার লক্ষ্যে। বাংলাদেশ এই আগ্রাসী যুদ্ধতৎপরতা কতদুর বিস্তার লাভ করেছে এবং কিভাবে বিস্তারিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রথমেই আমাদের পরিচিত হওয়া আবশ্যক গোটা বিশ্বে কিভাবে, কোন কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে এই সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা পরিচালনা করা হচ্ছে।

সংবাদপত্র

প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার সংবাদপত্রের কথা। সংবাদপত্রের সংখ্যাগত হিসেবের দিকে তাকালে দেখা যায় যে ইউরোপ ও আমেরিকায় যখন সংবাদপত্র সহজলভ্য ঠিক সেই সময়টিতে প্রতি ১০০ জন আফ্রিকাবাসীর জন্যে রয়েছে ৪ দশমিক ৫ কপি সংবাদপত্র. আফ্রিকার ৮টি দেশে কোনো সংবাদপত্রই নেই, ১৩টি

www.pathagar.com

দেশে মাত্র ১টি করে সংবাদপত্র রয়েছে। এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিবাস হলেও গোটা বিশ্বের মাত্র ১২ দশমিক ৫ শতাংশ সংবাদপত্র বেরোয় এখান থেকে। ফলে সংবাদপত্রের সংখ্যাল্পতা সৃষ্টি করে দেয় তথাকথিত 'উন্নত' দেশগুলোর জন্য এক অভাবনীয় সম্ভাবনাপূর্ণ বাজারের। সেই বাজার দখল করতে ছুটে আসতে থাকে সংবাদপত্রের মালিকেরা। মার্কিন সংবাদপত্র টাইম, নিউজউইক আর ব্রিটিশ সংবাদপত্র ইকনোমিস্ট হচ্ছে সেই বাজার দখলের অনন্য উপকরণ। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী টাইম-এর এশিয়া সংস্করণের প্রচার সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার, টাইম-এর ল্যাটিন আমেরিকা সংস্করণ বিক্রি হয় ১ লাখ ১৫ হাজার। টাইম-এর সারা বিশ্বে ২০০ ধরনের সংস্করণ হয়, অভিন্ন আধেয় নিয়ে। এর অতিরিক্ত প্রতি বছর টাইম এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকায় সারা বছরে প্রায় ২ লাখ কপি বিনামূল্যে সরবরাহ করে আগ্রহীদের মধ্যে। ১৯৭৬ সাল থেকে 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল'-এর এশিয়া সংস্করণ প্রকাশ শুরু হয়েছে। প্যারিস থেকে মার্কিনী মালিকানায় প্রকাশিত সংবাদপত্র 'ইনটারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন' ১৯৮০ সালে তাদের এশীয় সংস্করণ বের শুরু করেছে। এ সকল সংবাদপত্র কেবল পত্রিকা বের করেই সন্তুষ্ট থাকছে তা নয়, নিউ ইয়র্ক টাইমস, লস এন্জেলস টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা প্রতিদিন ৪০টি দেশের ১০০টি সংবাদপত্রের কাছে তাদের ব্যুরো অফিসের মাধ্যমে পৌছে দিচ্ছে ৩৫ হাজার শব্দের ভাণ্ডার—এগুলো সবই হচ্ছে সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে তা যেন ছাপা হয় ঐ সকল গ্রাহক সংবাদপত্রে। নিদেন পক্ষে পঠিত হয় সম্পাদকীয় বিভাগের সাংবাদিকদের দ্বারা।

পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলোর এই ঔদার্যপূর্ণ বাণিজ্যের কারণ বুঝতে চাইলে সংবাদপত্রগুলোর আধেয় (content)-এর দিকে তাকাতে হবে প্রথমেই। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধরা পড়ে যাওয়া একটি ঘটনাই প্রমাণ করবে এরা কি ছাপে। নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন সেপ্টেম্বর '৮১তে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন ছাপে কাম্পুচিয়া প্রসঙ্গে, কাম্পুচিয়া থেকে থাইল্যান্ড হয়ে ফিরে সুইজারল্যান্ড থেকে পাঠানো মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার জোনসের প্রতিবেদনে দক্ষিণ পশ্চিম কাম্পুচিয়ায় একটি বড় যুদ্ধের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং বলা হয় সেখানে পল পট বাহিনী বড় ধরনের ঘাঁটি স্হাপন করেছে এবং তিনি নিজে পল পটকে সেখানে দেখেছেন। ১৯৭৯ সালের পর যে পল পটকে দেখা যায়নি তাকে স্বচক্ষে দেখার এই বর্ণনা, যুদ্ধ কাহিনী এবং যুদ্ধে ভিয়েতনামী হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক ও নৌবাহিনীর উপস্থিতির 'বিশ্বস্ত' বর্ণনা সম্বলিত প্রতিবেদনটি প্রবল সাড়া জাগায়। এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর ১৩ জানুয়ারি

www.pathagar.com

নিউ ইর্য়ক থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ''ভিলেজ ভয়েস'' অভিযোগ করে যে জোনসের প্রতিবেদনে বর্ণিত একটি চরিত্র আঁদ্রে মলরোর চল্লিশের দশকে ইন্দোচীন সম্পর্কে লেখা একটি উপন্যাসের চরিত্রের হুবহু প্রতিরূপ। জোনস স্বীকার করেন 'খানিকটা রং চড়ানোর' জন্যে তিনি ঐ বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন। পরে ফেব্রুয়ারিতে জোনস স্বীকার করেন তিনি কাম্পুচিয়া যাননি। তিনি জুলাইয়ের ৪ সপ্তাহ তার বাবা-মা'য়ের এ্যাপার্টমেন্টে বসে এই প্রতিবেদন তৈরি করে সুইজারল্যাণ্ড চলে যান এবং যেন সবেমাত্র থাইল্যান্ড থেকে এসেছেন তেমনিভাবে সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো থেকে এই প্রতিবেদনটি নিউ ইর্য়ক পাঠান। এই প্রতিবেদনে বর্ণিত একটি চরিত্র 'কমরেড কানিকা' সম্পর্কে বলা হয়েছিল কাম্পুচিয়ায় যুদ্ধরত 'চমৎকার বলশালী ধূসর চুলের পুরুষ'। পরে কাম্পুচিয়ার কর্তৃপক্ষ জানালেন কমরেড কানিকা হচ্ছেন একজন মহিলা, কাজ করেন প্যারিসে, খেমার বাহিনীর অফিসে।

প্রতিবেদনে মিথ্যাচারের এই ঘটনা ব্যতিক্রমমূলক নয় বরং সাধারণ। এই সংবাদপত্র এমন কি ছবি ব্যবহারেও মিথ্যাচারের পথ বেছে নেয়। তার প্রমাণ লা ফিগারোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। নিকারাগুয়ায় বিপ্লবী সরকার ক্ষমতা দখলের পর 'লা ফিগারো' ম্যাগাজিন ২-পৃষ্ঠা জুড়ে সচিত্র প্রতিবেদন ছাপে যে, ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর যে মার্কসবাদী গেরিলারা হন্ডুরাসে প্রবেশ করে তারা মহিলা ও শিশুসহ ২০০ লোককে গুলি করে হত্যা করছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের শবদেহ। সাথে ছবি ছাপা হয় মৃতদেহের স্তূপ, অর্ধ পোড়া শবদেহের। প্যারিসে অবস্থিত নিকারাগুয়ার দূতাবাস এর প্রতিবাদ করে। পরে 'লা ফিগারো' এবং মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এডরিয়ান ফিশার স্বীকার করেন ঘটনা মিথ্যে। প্রকৃতপক্ষে এ ছবি সামোজা সরকারের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের।

প্রতিবেদন ও ছবিতে এই সর্বৈব মিথ্যাচারকে আমরা বিচ্ছিন্ন করতে চাই না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচার ও বিভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে, এমনকি ঘটনার পেছনের ঘটনার আড়াল রাখবার প্রচেষ্টা থেকেও। উল্লেখিত দু'টি ঘটনা সংবাদপত্রে মিথ্যাচারের যে প্রমাণ হাজির করছে তার কারণ কি? কেবলই কি সেনসেসনালইজম? কেবলই কি পত্রিকার কাটতি বৃদ্ধি? আমার কাছে তা মনে হয় না। বরং তার উত্তর পাই লেনিনের একটি উক্তিতে ঃ When the bourgeoisie's ideological influence on the workers declines, is undermined or weakened, the bourgeoisie everywhere and always resorts to the most outrageous lies and slander (Lenin, Collected Works, Vol: 20, Progress Publishers, Moscow, 1977 P.485).

www.pathagar.com

এরপর তাকাবো সংবাদ সংস্থাগুলোর দিকে। সংবাদ সংস্থাগুলোর আগ্রাসী তৎপরতা বহুল আলোচিত। এক সময় মার্ক টোয়েন ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, পৃথিবীতে সূর্য আছে দুটো—প্রভাত সূর্য আর এপি। মার্ক টোয়েনের যুগে ব্রিটেনের রয়টার, ফ্রান্সের হাভাস, জার্মানীর উলফ আর যুক্তরাষ্ট্রের এসোসিয়েটেড প্রেসই ছিলো প্রধান বার্তা সংস্থা। তারপর কালক্রমে হাভাস ও উলফের যুগ শেষ হলেও ফোর সিস্টার্স– এর যুগের অবসান হয়নি। এপি, ইউপি আই, এ এফ পি ও রয়টার আজ গোটা বিশ্বকে ভাগ করে নিয়েছে খবরের বাণিজ্য করার জন্যে। এপি ৯ হাজার গ্রাহকের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রচার করছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ শব্দ, পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্বের এক–তৃতীয়াংশ মানুষের কাছে। এশিয়ায় সে প্রতিদিন পাঠাচ্ছে ৯০ হাজার শব্দ, অন্যদিকে এপি এশিয়া থেকে নিচ্ছে মাত্র ১৯ হাজার শব্দ। ইউপিআই প্রতিদিন প্রচার করে ন্যূনতম ৫০ হাজার শব্দ। এ এফ পি কেবল এশিয়াতেই প্রতিদিন প্রচার করে ৩০ হাজার শব্দ, আর গ্রহণ করে ৮ হাজার শব্দ। সবচেয়ে বৃহৎ সংস্থা রয়টারের হিসেব দেয়াও কঠিন কাজ। ১৫৯টি দেশে ছড়ানো সার্বক্ষণিক সাংবাদিক ও প্রতিনিধিরা খবর যোগাড় করেছেন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তা ততোধিক দেশে। এই ৪টি সংবাদ সংস্থার আধিপত্য যে কতটা বিস্তারলাভ করেছে তা বোঝা যায় একজন এশীয় যোগাযোগ বিশেষজ্ঞের মন্তব্যে ঃ ''এটাতো কৌতুহলোদ্দীপক হিসেব যে ৯০টিরও বেশি দেশের আজ নিজস্ব জাতীয় সংবাদ সংস্থা রয়েছে। কিন্তু তবুও দুঃখজনকভাবে তারা এখনও অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ৪ প্রধান সংবাদ সংস্থার উপর ঃ নিউ ইয়র্কের এ পি ও ইউ পি আই, প্যারিসের এ এফ পি ও লণ্ডনের রয়টার। বিশ্বব্যাপী সংবাদ–শব্দ ও রেডিও ফটো প্রবাহের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে ৪ বহুজাতিক কর্পোরেশন। ইউনেস্কোর এক সমীক্ষায় দেখা যায় বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত সংবাদে তৃতীয় দুনিয়ার অংশভাগ ২০ শতাংশের কম, কার্যত ১৫ শতাংশের কাছাকাছি। এশিয়া (চীন ও জাপান ছাড়া) আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার পত্র–পত্রিকা ও রেডিওতে প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত সংবাদের ৯০ শতাংশেরও বেশি আসে নিউ ইয়র্ক,প্যারিস ও লণ্ডন থেকে। ''(মিডিয়া এশিয়া, সিংগাপুর, খণ্ড ১০ সংখ্যা ১, পৃঃ ৩০ উদ্ধৃত মফিদুল হক, মনোজগতে উপনিবেশ, প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮৫ পৃঃ ৬৫)।

এশীয় যোগাযোগ বিশেষজ্ঞের এই মন্তব্যের প্রমাণ মেলে ডঃ

www.pathagar.com

ডইলবার শ্র্যামের ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরের সমীক্ষায়। ৯টি এশিয়া দেশের ১৪টি সংবাদ পত্রের আধেয় বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান এই সব সংবাদপত্রে প্রকাশিত তৃতীয় বিশ্বের খবরের ৭৬ দশমিক ৪ শতাংশের যোগানদার হচ্ছে ঐ ৪ সংস্থা, জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্থা দিয়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৯ শতাংশ (উদ্ধৃতি, মফিদুল হক, পূর্বোক্ত)। এশীয় সংবাদ সংস্থাগুলো কত সংবাদ শব্দ প্রতিদিন প্রচার করে তার হিসেব দেখলেই বোঝা যায় এই ৪ সংবাদ সংস্থার সামনে তাদের অবস্থা কি। ভারতের পিটিআই (প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া) প্রতিদিন প্রচার করে ৭৫ হাজার শব্দ, ইন্দোনেশিয়ার আনতারা— ইন্দোনেশীয় ভাষায় ৬৯ হাজার, ইংরেজীতে ২৭ হাজার, ফিলিপাইন নিউজ সার্ভিস ১ লাখ ৫০ হাজার, মালয়েশিয়ার বার্নামা–২ লাখ শব্দ প্রেরণ করে প্রতিদিন।

এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট যে সংবাদের আদান–প্রদানে এশিয়া–আফ্রিকা–ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো কি অভাবনীয় বৈষম্যের শিকার হয়ে আছে। শুধু এই পরিসংখ্যানই নয়, আরো একটি হিসেব উপস্থাপন করলে বোঝা যাবে কথিত দেশগুলোর এই বার্তা সংস্থাগুলো কিভাবে ব্যবহার করছে এই অঞ্চলগুলোকে। ল্যাটিন আমেরিকার ১৬টি প্রধান দৈনিক সংবাদপত্র বিদেশী সংবাদের শতকরা ৮০ ভাগ প্রায় এই ৪টি বার্তা সংস্থা থেকে। এরা ল্যাটিন আমেরিকা থেকে প্রায় কোন খবরই পাঠায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩টি প্রধান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক—এবিসি, সিবিএস, এনবিসি প্রচারিত ১০৮টি সান্ধ্য–কালীন খবরের উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, এর মাত্র শতকরা ২০ শতাংশ বিদেশী খবর প্রচার করে। আর এই বিশ শতাংশের মাত্র ২ শতাংশ ল্যাটিন আমেরিকা সম্পর্কে। এ তথ্য প্রমাণ করে বিশ্বের এ সকল অনগ্রসর অঞ্চল থেকে এরা খবর নেয় কম, দেয় বেশি। যাও নেয় তাও প্রচার করে না।

শুধু কি তাই ? কোন্ ধরনের সংবাদ এরা প্রচার করে সেটাও লক্ষ্য করবার বিষয়। সোভিয়েত লেখক এ গ্র্যাচেভ এবং এন ইয়েরমোশকিন 'এ নিউ ইনফরমেশন অর্ডার অর সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার' গ্রন্থে ল্যাটিন আমেরিকা প্রসঙ্গে দেখান যে এই সব বার্তা সংস্থা ল্যাটিন আমেরিকার সেই সংবাদগুলোই প্রচার করে যা পশ্চিমা বিশ্বের জন্যে ''প্রয়োজনীয়'' বলে বোধ হয়, ল্যাটিন আমেরিকার প্রকৃত বাস্তবতাকে যা প্রতিফলিত করে না এবং ল্যাটিন আমেরিকার যে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকার আর্থ–সামাজিক পরিবর্তনে আগ্রহী তাদের সম্পর্কে গড়ে তোলে নেতিবাচক ভাবমূর্তি। ১৯৮২ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ, ভারত, বার্মা, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ওপর বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের

www.pathagar.com

জরিপেও, (১) সামরিক, প্রতিরক্ষা, যুদ্ধ, রাজনৈতিক গোলযোগ, (২) বৈদেশিক সম্পর্ক (৩) দেশীয় সরকার ও রাজনীতি বিষয়ক-সংবাদ এর আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, যা উন্নয়নশীল এই দেশগুলোর জন্যে অগ্রগণ্যতায় দ্বিতীয় সারির। উন্নয়ন সাংবাদ ১০ শতাংশেরও কম ছাপা হচ্ছে। কেননা এই সমীক্ষা থেকেই আমরা জানি এদের শতকরা ৮০ ভাগ নির্ভরতা ঐ ৪টি সংস্থার ওপর।

সংবাদ নির্বাচনে এরা যেমন পশ্চিমা বিশ্বের প্রয়োজনকেই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে ঠিক তেমনিভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে এরা সংবাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয় পশ্চিমা বিশ্বের প্রভেদের দৃষ্টিভঙ্গি। যে কারণে পোপ জন পলের ওপর গুলি বর্ষণের খবরটি পরিবেশনের সময় প্রধান দুটি বার্তা সংস্থা গুলি বর্ষণকারীর চেহারার সাথে প্যালেস্টাইনী ও চিলির ''সন্ত্রাসবাদীদের'' মিলের কথাও উল্লেখ করে। ব্রাসেলসে ১৯৮১ সালের জুন মাসে পিএলও প্রতিনিধি গুলিবিদ্ধ হবার খবরটির সাথে এই ''অনুমানটিও'' সারা বিশ্বে প্রচারিত হয় যে, এটা ''চরমপন্থী আরব''-দেরই কাজ। পশ্চিমা বার্তা সংস্থাগুলো যে কত, ধরনের অপকৌশলে সংবাদ প্রচার করে তার একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেছিলেন গুয়াতেমালার সাবেক রাষ্ট্রপতি জুয়ান জোসে আরেভেলো তাঁর ''এন্টি কমিউনিজম ইন ল্যাটিন এ্যামিরিকা'' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন ল্যাটিন আমেরিকায় পুঁজিবাদী দেশের বার্তা সংস্থাগুলো ''হার্স্ট মেথড'' অনুসরণ করে। সেটা কি?

To fabricate news and present it as authentic, to mutilate news by truncating it; to turn slander into news and deny answering space to the victim; to edit news by alien elements; to delay publications, until the news losses its effect; to interpret news arbitrarily ; to bury important items under a deluge of commercial notices; to ban publications of certain stories; to attribute fictitious statements to someone; to put a phrase in quotes creatings the impression that it is a quotation; to say in the headline what the story doesn't say, etc.

আরেভেলোর এই সার-সংক্ষিপ্তকরণ যে ঐ ৪ প্রধান বার্তা সংস্থার জন্যে অত্যন্ত তীব্রভাবে সত্য তা বোঝা যায় যে নীতিমালার ভিত্তিতে এদেরই একটি পরিচালিত হয় তা থেকে। ইউপিআই'র নীতিমালায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে Get the story first and worry about the facts later (The Wall Street Journal, July, 11, 1979) ক্রমান্বয়ে এই মিস-ইনফরমেশনই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে এবং বার্তা সংস্থাগুলোর চোখে বিশ্বদর্শনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি—যা কাঙ্ক্ষিত ঐ বার্তা সংস্থাসমূহের।

www.pathagar.com

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তাদের 'দি জার্মান ইডিওলজি' গ্রন্থে বলেছিলেন, The class which has the means of material production at its disposal, consequently also controls the means of mental production, so that ideas of those who lack the means of mental production are on the whole subject to it. (Collected Works, vol.5 Progress Publishers, Moscow, 1976,P.59)

যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একথাটি প্রত্যক্ষ সত্যতা লাভ করেছে আমাদেরই চোখের সামনে। মাত্র ১৫টি বহুজাতিক কোম্পানি আজ গোটা বিশ্বের যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবসায়িক মালিকানা লাভ করেছে। আর এ সব ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির ব্যবসায়ী প্রকৃত মালিক হচ্ছে মরগান গ্যারান্টি ট্রাস্ট, চেইজ মেনহাটান ব্যাংক ও ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি ব্যাংকের মালিকরা। পরোক্ষভাবে কতিপয় ধনী বাণিজ্যিক ব্যাংকের হাতে গোটা বিশ্বের যোগাযোগ প্রযুক্তির মালিকানা অর্পিত হয়েছে। আর তারা কেবল ধনী বলেই নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কারণেও বিস্তার লাভ করছে বিশ্বের এই সব কথিত অনগ্রসর জনপদে। তার অন্যতম উদাহরণ আইটিটি। চিলির সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রে যুক্ত এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৪ সালে মোট লাভ করেছিল ১১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার, তার মধ্যে ৬ দশমিক ২ বিলিয়নই এসেছিলো ৬৭টি দেশে কর্মরত তাদের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে।

টেলিভিশন প্রাসঙ্গিক আলোচনার সূচনায় এই বিষয়টি উল্লেখ করলাম এ কারণেই যে যোগাযোগ প্রযুক্তির এ আধুনিক সংস্করণটি অপরাপর প্রযুক্তির মতোই করতল বন্দী কতিপয় বহুজাতিক কোম্পানির এবং মার্কস যে ভাবেই বলেছেন means of material production তাদের করতলে বলেই এটাকে তারা ব্যবহার করছেন আমাদের মনোজগতকে উপনিবেশবদ্ধ করতে। ভালো করে তাকালে দেখতে পাই গোটা বিশ্বের ইলেকট্রনিক মাধ্যম প্রযুক্তিকে করতলগত করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের আই বি এম, জেনারেল ইলেকট্রিক, আইটিটি, ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক, ওয়েস্টিংহাউস, নেদারল্যাণ্ডের ফিলিপস, পশ্চিম জার্মানীর সিমেন্স আর জাপানের এনইসি। টেলিভিশন প্রযুক্তি যে তা থেকে বাদ যায় না এই তালিকায় উল্লেখিত বহু নামের সাথে আমাদের পরিচয়ের সূত্র থেকেই তা প্রমাণিত।

প্রযুক্তির বিবেচনায়ই যে কেবল আমরা করতলগত হয়ে আছি তা নয়। আধেয়-বিশ্লেষণও প্রমাণ করে আমরা টেলিভিশনের সূত্রে

www.pathagar.com

কিভাবে বন্দী সাম্রাজ্যবাদের কাছে। ইউনেস্কোর অধীনে ফিনিশ গবেষক টাপিও ভেরিস এবং কার্ল নর্দেনস্ট্রেং ৫০টি দেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠানের ওপর গবেষণা চালিয়ে ৫টি উপসংহারে উপনীত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ (১) বিদেশে প্রেরণের জন্যে তৈরি টিভি-প্রোগ্রামগুলো কয়েকটি দেশের মুনাফা লাভ প্রচেস্টায় সীমিত। (২) ধনী পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কম মূল্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব প্রোগ্রাম বিক্রি করে। (৩) অধিকাংশ দেশের সম্প্রচার সময়ের বিরাট অংশ ব্যয় হয় এসব আমদানি করা প্রোগ্রাম দেখাতে। (৪) আমদানি করা এসব প্রোগ্রামের অধিকাংশই হচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, টিভি সিরিজ ও হালকা মনোরঞ্জক অনুষ্ঠান। (৫) টেলিভিশন সংবাদচিত্র বিনিময় ও বাণিজ্যের বিষয়টি সীমিত হয়ে আছে ৩টি পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে, ভিসনিউজ, ইউপিআই-টি এন, সিবিএস- নিউজ।

বাণিজ্যই তাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সেটা বোঝা যায় যে সকল সামগ্রী বিদেশে তারা রপ্তানি করেন তার আধেয় থেকেও। ব্রাজিলীয় সংবাদপত্র O Estado de Sao Paulo ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের ৬টি টিভি ষ্টেশনের এক সন্ধ্যার ৩ ঘণ্টার অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করে এক ভয়াবহ ছবি দেখতে পান। ঐ ৩ ঘণ্টায় প্রদর্শিত বিদেশাগত অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়েছে ৬৪টি খুন, ৩৮টি বন্দুক লড়াই, ১২টি লড়াই, ৩টি ডাকাতি ও ৯টি সড়ক দুর্ঘটনা। পশ্চিমা বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ চলচ্চিত্র দেশ ব্রাজিলেই এই হচ্ছে অবস্থা। আর ঐ সব যখন আমরা দেখতে পাই তখন? পৃথিবীর যে ৬ কোটি ৫০ লাখ লোক প্রতিদিন মার্কিন টিভি প্রোগ্রাম দেখছেই আমরা তো তারই মধ্যে এক দল মানুষ। প্রতিদিন এই সকল লোমহর্ষক ঘটনা দেখতে দেখতে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়ায়/দাঁড়াচ্ছে/ দাঁড়াবে ফরাসী সাংবাদিক মরিস মাসিনো তার একটা চমৎকার চিত্র দিয়েছেন। তার মতে এসব দেখতে দেখতে অভ্যস্ত আমাদের চোখের সামনে যখন বাস্তবেই এমন ঘটনা ঘটবে তখন সহানুভূতিহীনভাবে আমরা প্রশ্ন করবো ঃ মাত্র একশ জন মরেছে? কিন্তু কেনো উন্নয়নশীল দেশগুলো এ সব ছবি কেনে? ইউনেস্কোর জরিপে দ্বিতীয় কারণটি মনে করুন, কেনে কেননা তা স্বল্প মূল্যে মেলে। ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র একটি আধঘণ্টার ছায়াছবি ২ লাখ ডলার খরচ করে বানিয়ে কোস্টারিকার কাছে ৬০/৭০ ডলারে, কেনিয়ার কাছে ২৫/৩০ ডলারে বিক্রি করেছে। সংবাদ-চিত্রের এই স্বল্প মূল্যের সুবিধার কারণেই ব্রিটিশ 'ভিস নিউজ' যখন তানজানিয়ার টিভির জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিতর্কের সচিত্র প্রতিবেদন পাঠিয়েছে তখন পার্শ্ববর্তী দেশ উগান্ডার কৃষি প্রদর্শনীর খবর গুরুত্বহীন হয়ে প্রচারিত হয়েছে ঐ অর্থহীন পার্লামেন্ট বিতর্কের খবরের কাছে।

www.pathagar.com

অর্থ মূল্যের বিবেচনায় ও সহজপ্রাপ্যতার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেলিভিশন প্রোগ্রামের বড় অংশই দখল করে নিয়েছে এই সব বিদেশাগত ছবি ও সংবাদ-চিত্র। এই অবাধ প্রবাহের ফলে একদিকে দেশীয় সংস্কৃতির মূলোৎপাটিত হচ্ছে তারই সাথে সাথে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়া হচ্ছে আমাদের মানসিক ভাবে। ক্রমান্বয়েই আমাদের করে তোলা হচ্ছে ক্রীড়নক সাম্রাজ্যবাদের হস্ত পদ সঞ্চালনে যারা ক্রিয়া করে।

বই

মনোজগতে উপনিবেশ স্থাপনে বইও যে এক অনন্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে তা প্রকাশনা জগতের দিকে ভালো করে তাকালেই বোঝা যায়। পাকিস্তানের বিখ্যাত লেখক ফয়েজ আহমদ ফয়েজ লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিকী ভিউ পয়েন্ট-এ লিখেছিলেন যে, একজন এশীয় বা আফ্রিকান লেখককে এমন কি তার নিজ দেশে খ্যাতি অর্জন করতে হলে দারস্থ হতে হয় পশ্চিমা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের। কথাটি যে কত নির্মম সত্য তা বোঝা যায় এই তথ্যে যে একমাত্র মার্কিনী প্রকাশনাগুলোই বছরে ন্যূনতম ৩০ কোটি ডলারের বই বিক্রি করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাতে। আর তাও আবার একচেটিয়াভুক্ত হয়ে আছে মার্কিনী
কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থার হাতে। হার্স্ট কর্পোরেশন, ওয়েস্টার্ন পাবলিশার্স, ওয়াল্ট ডিজনী প্রডাকশান্স ও রিডার্স ডাইজেস্ট হচ্ছে সেই সকল একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের অন্যতম। হার্স্ট কর্পোরেশন একাই মাসে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বই, ব্রোসিয়ার, সচিত্র নভেল, কার্টুন ইত্যাদি প্রচার করে। ভীতিকর তথ্য হলো এই যে মাত্র ১০টি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সারা বিশ্বের পুস্তক ব্যবসার প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ম্যাকগ্রোহিল, জেরোক্স, সিবিএস, আরসিএ, প্রেন্টিস-হল, স্কট, ফ্রেসম্যান এন্ড কোং, আইটিটি, ওয়েস্টিং হাউস এবং জেনারেল লার্নিং কোং। এশিয়া ও আফ্রিকার পুস্তক বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় মার্কিন, ফরাসী ও ব্রিটিশ প্রকাশক ব্যবসায়ীদের দ্বারা। ব্রিটেনের নিশ্চিত বাজার রয়েছে ৭০টি দেশে। ব্রিটিশ পাবলিশার্স এসোসিয়েশনের সচিব রোনান্ড বার্কারের হিসাব অনুযায়ী ব্রিটিশ ও মার্কিনী প্রকাশকরা বছরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় ৩০ হাজার টাইটেলের বই প্রেরণ করে থাকে।

এই অসংখ্য স্রোত যদি জ্ঞানের অবাধ বিতরণের লক্ষ্যে হতো তবে তা ছিলো আনন্দিত হবার মতো ঘটনা। একথা শুনে তবে

www.pathagar.com

আমরা উল্লাস করতাম যে একটি ফরাসী প্রকাশনা সংস্থা Hachette ৩৩টি দেশে অফিস স্থাপন করে অসংখ্য ভাষায় পুস্তকাদি প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমাদের উল্লসিত হবার অবকাশ থাকে না এ কারণে যে, কোন ধরনের বই এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার বাজারে আসবে তা নিয়ন্ত্রিত হয় মার্কিন সরকারী সংস্থা 'ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন এজেনসী' (USIA) দ্বারা। এক কথায় এই প্রতিষ্ঠানটি বছরে ৩০টি ভাষায় ১ হাজার প্রচারণামূলক বই প্রকাশের জন্যে অর্থের যোগান দিতো। এখন তার দায়িত্ব হচ্ছে বাজারের বা লাইব্রেরীতে বই পাঠাবার পথে তালিকা তৈরিতে 'সাহায্য' করা। ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির কাছে মার্কিন প্রকাশকরা জমা দিয়েছে ১ মিলিয়ন বই, এর মধ্যে রয়েছে ৫০টি বেস্ট সেলার।

'বেস্ট সেলার' হয়ে ওঠা এই সব বইগুলোর সারবস্তু কি ? সব রকম সামাজিক সমস্যার বাইরে গিয়ে জোলো মনোরঞ্জন, পর্নোগ্রাফি আর স্পাই থ্রিলার। এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রচুর বিজ্ঞাপন, চকচকে ঝকঝকে ছাপা, স্বল্প মূল্যের জোরে ২ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে যে ধরনের বই তার একটি বইয়ের নাম হলো ''দি স্পাই হু কেইম ইন ফ্রম দি কোল্ড''। জন ল্যাকের-এর বিখ্যাত এই গ্রন্থটি স্রেফ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী-প্রচারণা ছাড়া আর কিছু নয়। এই লেখকের অপর বই ''দি অনারেবল স্কুল বয়''একই লক্ষ্যে রচিত। উল্লেখ্য জন ল্যাকের একজন সাবেক সিআইএ গোয়েন্দা, যার প্রকৃত নাম ডেভিড কর্নওয়েল। শেষের বইটির প্রকাশক হুডার ও স্টাউটন, যারা অপর মার্কিনী গোয়েন্দা এডওয়ার্ড হান্টরের আফগানিস্তান বিষয়ক আপত্তিকর একটি গ্রন্থের প্রকাশক।

পুস্তক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাধারণ ও নৈমিত্তিক ঘটনারই উদাহরণ মাত্র। বই তাই আজ আর কেবল জ্ঞান রাজ্যের প্রবেশ দ্বার নয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের চারণ ভুমিও বটে।

'অলাভজনক' প্রতিষ্ঠান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ খবরাখবর যারা রাখেন তাদের কাছে ''অলাভজনক ফাউন্ডেশন''-এর কথা নতুন নয়। আর্থিক ও মানসিক দিক দিয়ে গোটা বিশ্বের সেরা চিন্তাবিদদের সহযোগিতা করা এ সকল ফাউন্ডেশনের একটি ''মহতী'' দায়িত্ব। এ ধরনের ১৭ হাজার ফাউন্ডেশন কর্মরত রয়েছে। তার মধ্যে ২৫০ টি ফাউন্ডেশনের পেছনে ব্যয় মোট ব্যয়িত অর্থের অর্ধেক। -আর তার শীর্ষ দেশে রয়েছে ২টি ফাউন্ডেশন— ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও রকেফেলার ফাউন্ডেশন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের এসেটের পরিমাণ ৩ মিলিয়ন ডলার, রকফেলার ফাউন্ডেশনের এসেট ৩৫০

www.pathagar.com

মিলিয়ন ডলার। এ ধরনের আরেকটি ফাউন্ডেশনের নাম আমরা প্রায় সকলেই জানি— এশিয়া ফাউন্ডেশন। এ সকল ফাউন্ডেশন ‘‘অলাভজনক’’, ‘‘অবাণিজ্যিক’’ এই লেবেলের আওতায় প্রতি দিন গোটা বিশ্বের সেরা চিন্তাবিদদের সরবরাহ করে চলেছে নতুন নতুন চিন্তাযোগ্য বিষয়। আর্থিকভাবে এরা সহযোগিতা করছে সে সকল গবেষণায় যা মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করবে মানস জগতে আধিপত্য বজায় রাখতে। সর্বোপরি স্থানীয় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় দীর্ঘস্থায়ী করবে। এশিয়া ফাডন্ডেশন ভারতের লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়েছে এমন অভিযোগ বহুবার হঠেছে। এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রথম সভাপতি আর ব্লুম স্বীকার করেছেন তাদের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে to help Asian countries fight communism on their own soil. এই লক্ষ্যে পরিচালিত ফাউণ্ডেশনগুলো যে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে বা অর্থ যোগায় তার উদ্দেশ্য কি বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?

তথ্য সংস্থা

১৯৮২ সালের ১৭ই মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সামনে যুক্তরাষ্ট্র তথ্য সংস্থা (USIA)কে এ পরিচালক চার্লস উইক বর্ণনা করেছিলেন highly important and indispensiable element of the apparatus ensuring the country's national security. এই মন্তব্য কি একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কর্তৃক তার প্রতিষ্ঠান-প্রীতি নাকি প্রকৃতপক্ষেই যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে তা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে USIA কি করে তার দিকে তাকালেই। ১৯৫৩ সালে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি গত ২৪ বছরে বিভিন্ন সময়ে নাম পাল্টালেও যে লক্ষ্য থেকে এক কদমও সরে আসেনি তা ব্যক্ত হয়েছে ১৯৬৩ সালে presidential memorandum-এহাবার্ট শিলার তার ‘দি মাইণ্ড ম্যানেজারস’ গ্রন্থে তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন The USIA help achieve United States objectives by influencing public attitudes in other nations (The Mind Managers, Bacon Press, Boston, 1973, P.44). আর এ জন্যে এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৭৯ সালে (যখন এর নাম ছিলো International Communications Agency) ছিল ৪শ মিলিয়ন ডলার। এখন ১২৬ টি দেশে USIA ৯ হাজার কর্মচারী ২০টি ভাষায় প্রকাশনার সাথে যুক্ত এবং এর ব্যয়ের পরিমাণ (১৯৮৩-র হিসেবে) ৬৪০ মিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই লক্ষ্যে সাজানো তথ্যের বাছাইয়ের কাজটি করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

প্রায় একই ধরনের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ কাউন্সিল আপাত, দৃস্টে যতই একাডেমিক কাজে ব্যাপৃত থাকুক না কেন সাম্রাজ্যের শেষ উপনিবেশ রক্ষা, তথ্য বিকৃতির মাধ্যমই করছে।

রেডিও

'নিউ ইয়র্ক ডেইলী নিউজ' একবার ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিদের এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ট্যাংক, বি-ওয়ান বোমারু বিমান আর এম-এক্স মিসাইলের কথা ভাবতে গিয়ে যেন কম ব্যয় সাপেক্ষে রেডিও প্রচারণার কথা তারা বিস্মৃত না হন। নিউ ইয়র্ক ডেইলী নিউজের এই আশঙ্কা ছিলো সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরা বা ব্রিটিশ শাসনকর্তারা রেডিও-র গুরুত্ব কখনোই বিস্মৃত হয়নি।

ভয়েস অব আমেরিকা ৩৯টি ভাষায় সপ্তাহে যে ৯৪০ ঘণ্টার প্রচার অব্যাহত রেখেছে, এবং তার জন্যে যে ১৮৮ মিলিয়ন ডলার খরচ করছে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামত সম্বলিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ কখনোই বাদ যাচ্ছে না। তা ছাড়া সংবাদ নির্বাচনের মার্কিন স্বার্থের প্রাধান্য, মার্কিনী জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা আর সমীক্ষাই হচ্ছে এ সকল প্রচারণার সারবস্তু।

১৯৮০ সাল থেকে ভোয়ার বাংলা ও উর্দু অনুষ্ঠানের সময় শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধিও এর অন্যতম কারণ। বিবিসি'র ৩৮টি ভাষায় প্রচারিত সাপ্তাহিক ৮০০ ঘণ্টার অনুষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশের সংবাদ কতটা প্রচারিত হয় ? উভয় বেতার কেন্দ্রই কি তথ্য সংস্থাগুলোর মতো সংবাদ নির্বাচনে পশ্চিমের আগ্রহ ও প্রয়োজনকেই অধিকরতর গুরুত্ব দেয় না?

প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তথ্য সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটি, তার বিচিত্র আগ্রাসী হাতের উপায় ও উপকরণের সাথে পরিচিত হবার পর বাংলাদেশে তার স্বরূপ অন্বেষার প্রয়াস আমরা চালাতে পারি।

তথ্য সাম্রাজ্যবাদ বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এক অসামান্য উপকরণ যে বিদেশী সংবাদপত্রগুলো, তার জন্যে এ দেশের দরজার অর্গল বন্ধ হয়নি কখনোই। বরং আমাদের বহুল প্রচারিত বলে কথিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্রসমূহের 'আন্তর্জাতিক' বিভাগের বহু রচনাই এ সকল সংবাদপত্রের হুবহু অনুবাদ মাত্র। ১৯৮৩-৮৪ সালে এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। তা ছাড়া সাপ্তাহিক রোববার

www.pathagar.com

১৯৮০–৮১ সালে প্রায় ১ বছর ধরে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ'– এর ওপর যে ধারাবাহিক রচনাটি প্রকাশ করে, এ সব সাপ্তাহিকের বহুদিনের মগজ ধোলাইয়ের তা এক অনন্য উদাহরণ। এখানে প্যালেস্টাইন থেকে সাহারার মরু প্রান্তরের লড়াকু মুক্তিযোদ্ধা সকলেই চিহ্নিত হয়ে যান 'সন্ত্রাসবাদী' বলে। এ ঘটনা ব্যতিক্রম–মূলক নয়, বরং অসংখ্য সাধারণের একটি উদাহরণ মাত্র। আমাদেরই দেশের একটি ইংরেজী দৈনিক মাসাধিক কাল বিভিন্ন বিদেশী সংবাদপত্রের পাতার পর পাতা এমনকি কম্পোজ পর্যন্ত করবার ঝুট ঝামেলায় না গিয়ে ছবির আকারে মুদ্রণ করেছে এবং তা বিলি হয়ে পাঠকদের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে প্রতিদিন। উপসম্পাদকীয় মন্তব্যে এই সকল সংবাদপত্রের উদ্ধৃতির জন্যে প্রবল অনুসন্ধানের আবশ্যকতা নেই। যে কোনো সচেতন পাঠকই তা উপলব্ধি করবেন।

বহুল কথিত বার্তা সংস্থা ও ফটো সার্ভিসের সৌজন্যে আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে কত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় সংবাদাদি যে প্রতিদিন ছাপা হচ্ছে মন্জুরুল হক 'মুক্তির দিগন্ত' নামক একটি সাময়িকী'তে (১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা) জুলাই '৮১–র কয়েকদিনের সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করে তার প্রমাণ হাজির করেছিলেন। পশ্চিমা নারীদের ফ্যাশনের ছবি, রানী মাতার জ্বর হওয়ার সংবাদ, বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পোশাক ধারিণীদের ছবি, কৃত্রিম ফারের বিলাসবহুল নতুন পোশাকে সুন্দরীর ছবি ছিলো সে সময়কালে উল্লেখযোগ্য প্রমাণপত্র। চার্লস ডায়ানার বিয়ে নিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রের মাতামাতি যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছিলো তা কার না মনে আছে। এই রাজকীয় বিবাহের খবর নিয়ে বহুবর্ণা প্রচ্ছদ কাহিনী (বলাই বাহুল্য বিদেশী কাগজের প্রচ্ছদ কাহিনীর অনুবাদ) ছাপেনি সে সময়, এমন সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন কয়টা ছিলো? এ অবস্থা যে আজও অপরিবর্তিত আছে তার প্রমাণ মেলে '৮৭–র মার্চ মাসের প্রথম ৭ দিনের 'বাংলাদেশ অবজারভার' পত্রিকাটি ঘাটলেই। ১ থেকে ৭ মার্চ বাংলাদেশ অবজারভার–এর মোট ২৫টি উপ–সম্পাদকীয়ের ১৮টিরই বিষয় দেশীয় সমস্যা বা সম্ভাবনা নয়, সম্পূর্ণতই বিদেশী বিষয়, যার মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিক্ষেত্রে মার্কিনীদের অগ্রগতির স্তুতি (৬ মার্চ) এবং ইউসিসের পাঠানো আরেকটি বিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধ (১ মার্চ) পর্যন্ত। কোরীয় ভাষা বা জাপানী তরুণদের অবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশের জোর জবরদস্ত যৌক্তিকতা হাজির করা যাবে, কিন্তু চেক মিউজিয়াম বা জাপানী স্কুল ছাত্রদের দুপুরের খাবার প্রসঙ্গের অবতারণার যৌক্তিকতা কোথায়? এ তো গেলো উপসম্পদকীয় প্রসঙ্গ। কি ধরনের খবর বার্তা সংস্থাগুলোর কল্যাণে আমাদের সংবাদপত্রে গুরুত্ব পেয়েছে তারও নজির মেলে ঐ ৭ দিনের কাগজেই। প্রিসিলা

www.pathagar.com

প্রিসলির ৭ পাউণ্ড সাড়ে ১০ আউন্স পুত্র সন্তান লাভের খবর রয়টারের কল্যাণে প্রাপ্ত হয়ে আমাদের সংবাদপত্র আনন্দিত চিত্তে মুদ্রণ করেছে (৩ মার্চ), চিত্রনায়ক র‍্যানডলফ স্কটের মৃত্যুসংবাদ রয়টার ২ দিন পাঠিয়েছে, অবজারভার ২ দিনই ছেপেছে (৪ ও ৫ মার্চ)। এটা না হয় নেহাতই ভুল। কিন্তু আমাদের জীবনে এ সবের তাৎপর্য কি সেটা কে কাকে বোঝাবে? শুধু কি তাই। একদিনেই দেখতে পাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগানের স্ত্রী ন্যান্সি রেগান সম্পর্কে ৩টি উৎস থেকে পাওয়া অপ্রয়োজনীয় ৩টি সংবাদ ছাপা হয়ে যায় সংবাদপত্রে। ৬ মার্চ প্রকাশিত ন্যান্সি রিগান সম্পর্কে এই তিনটি সংবাদের উৎস হচ্ছে রয়টার, এএফপি ও নিউ ইয়র্ক টাইমস। এএফপি যে খবরটি পাঠিয়েছে সেটি আবার নিউ ইয়র্ক টাইমসেরই উদ্ধৃতি। রয়টারের পাঠানো খবরের সূচনা (লীড) হচ্ছে এই রকম ঃ President Regan yesterday angrily denied his wife Nancy was a 'dragon Lady' who was ruining the country. এএফপি জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ন্যান্সির প্রশংসা করেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতার খবরের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় ন্যান্সি তার স্বামীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অস্ত্র সীমিত করণ চুক্তিতে এবং গর্বাচেভের সাথে বৈঠকে বসতে চাপ দিচ্ছে।

পশ্চিমা বার্তা সংস্থার কল্যাণে কেবল যে অকিঞ্চিৎকর সংবাদ ছাপা হচ্ছে তাই নয়, এ সকল খবর যে গুরুত্ব পাচ্ছে, অন্তত ন্যান্সি রিগানের ক্রুদ্ধ মন্তব্য যে গুরুত্ব পাচ্ছে, ততটা গুরুত্ব পাচ্ছে না গত ২০ বছরে অধিকৃত আরব এলাকা থেকে গ্রেফতারকৃত ৫ লাখ ফিলিস্তীনির জেলে আটকে থাকার খবর (২ মার্চ)। যদি তার কারণ এভাবে চিহ্নিত করি যে, খবরটি ঐ চার সংস্থার কেউ পাঠায় নি, পাঠিয়েছে কিউ এন এ, তাই এই অবস্থা?

এই সকল বার্তা সংস্থা কেবল অপ্রয়োজনীয় খবর পাঠায় ও পরোক্ষভাবে ছাপতে বাধ্য করে। এর সাথে সাথে উল্লেখ্য যে তারা তাদের মতামতও আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়। তার প্রমাণ ম্যানিলা থেকে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যে কোন সংবাদ দেখলেই বোঝা যায়। যে কমিউনিস্টরা মার্কোস বিরোধী লড়াইয়ের অগ্রণী যোদ্ধা ছিলো, আজ এএফপি ও রয়টার তাদের আগে rebel (বিদ্রোহী) শব্দটি ব্যবহার করে এবং রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে ইত্তেফাক, অবজারভার ও সংবাদ তাই ছাপে (৬ মার্চ)। গোটা বিশ্বে কন্ট্রা কেলেঙ্কারীতে যুক্ত থাকার কারণে নিন্দিত ডোনাল্ড রেগানের স্থলাভিষিক্ত হাওয়ার্ড বেকার-এর নিযুক্তির সংবাদে তার নামের আগে পপুলার (জনপ্রিয়) শব্দটি রয়টার ব্যবহার করে এবং ইংরেজী ও বাংলায় অনূদিত হয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র মারফত পাঠকদের মনে গেঁথে যায় (১ মার্চ)। পিকিং থেকে রয়টার চীনা

www.pathagar.com

নেতৃত্বে বিভক্তি দেখতে পেয়ে পশ্চিমা কুটনীতিক সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে যে খবর পাঠায় ৩ মার্চ (৪ মার্চ) তা মুদ্রণে আমরা কুণ্ঠিত হই না, সূত্রের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করার যোগ্যতা নেই বলেই হয়তো বা সন্দেহও করি না। আর শুধু কি তাই? চীনের সম্ভাব্য একজন ভাইস-প্রিমিয়ার এখন একটি শহরের মেয়র হলেও একদা কাঠের মিস্ত্রি ছিলেন গোটা বিশ্বের কাছে সেটাই সংবাদের প্রথম লাইনে তুলে ধরে এমনিভাবে A former carpenter who is now Mayor of a Chinese city will be promoted to the post of Vice-Premier (পূর্বোক্ত সংবাদ)।

পশ্চিমা সংবাদ সংস্থাগুলোর ফটো সার্ভিসের কারণে কত অপ্রয়োজনীয় ছবি গুরুত্ববহভাবে ছাপা হয় তার দুটি উদাহরণই বোধ করি যথেষ্ট। ৩ মার্চ (৮৭) অবজারভারের ৪ নং পৃষ্ঠায় ৩ কলাম জুড়ে ছাপা ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় প্রিন্স অব ওয়েলস ও তার স্ত্রী পর্তুগাল সফরে গেলে ওপরটো বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্ররা তাদের টুপি বিছিয়ে গালিচা তৈরি করে দিয়েছিলো—রাজকীয় পরিবারের এই দম্পতি হেঁটে যাচ্ছেন তার ছবি। কোন রাষ্ট্রীয় সফর নয়, রাজা কিং জন দি ফার্স্ট ও ফিলিপার বিবাহের ৬ শততম বার্ষিকীতে যোগ দিতে গেলে তাঁরা যে সংবর্ধনা পান সে ছবির সংবাদমূল্যই বা কি? এই ৭ দিনে ম্যানিলা থেকে রয়টারের সূত্রে পাওয়া যে ২টি ছবি অবজারভার ছেপেছে উভয় ছবিতেই দেখানো হয়েছে ফিলিপাইনের সৈন্যরা কি ভাবে মার্কোসের পতনের প্রথম বার্ষিকী পালন করছেন (সেনাবাহিনী নেতা রামোসের ছবি ঃ মার্চ ৫, কয়েকজন সৈন্যের সংবাদপত্র পাঠের ছবি ঃ মার্চ ৭)। এই ছবির পেছনে উদ্দেশ্য কি এটাই মনে করিয়ে দেয়া যে, ফিলোপিনো সেনারাই মার্কোসের পতনের মূল শক্তি, জনগণ নন?

বাংলাদেশে এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের আরেকটি বিরাট হাতিয়ার হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। ১৯৮৩ সালে সমাপ্ত আমার একটি গবেষণায় আমি অনুষ্ঠানমালার আধেয় বিশ্লেষণ দেখতে পাই যে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালার একটি বড় অংশই বিদেশী আমদানিকৃত অনুষ্ঠান। এই আমদানিকৃত অনুষ্ঠানের পরিমাণ ১৯৬৬ সালে ৪১ দশমিক ৩৯ শতাংশ, ১৯৭০ সালে ৪৩ দশমিক ৫৮ শতাংশ, ১৯৭৩ সালে ৩৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে ৩৬ দশমিক ৩০ শতাংশ, ১৯৭৫ সালে ৩৬ দশমিক ৩১ শতাংশ, ১৯৭৬ সালে ৩৩ দশমিক ৮২ শতাংশ, ১৯৭৮ সালে ২৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ ও ১৯৮১ সালে ৪৭ দশমিক ২৪ শতাংশ। (এম এ কোর্সের শর্ত পূরণের জন্যে সম্পাদিত গবেষণা 'বাংলাদেশে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ঃ টেলিভিশন', অপ্রকাশিত)। আমদানিকৃত এই অনুষ্ঠানমালার প্রায় সবটাই হচ্ছে ছায়াছবি। এ সকল ছায়াছবির আধেয় বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা বাহুল্যমাত্র।

www.pathagar.com

টেলিভিশনের সংবাদচিত্র বিষয়ক একটি কথা এখানে উল্লেখ করে রাখা দরকার। বাংলাদেশ টেলিভিশন যে হারে শুল্ক প্রদান করে আমাদের সংবাদ-চিত্র দেখায় বোধ করি তা কম বলেই বিদেশী সংবাদ-চিত্রের খানিকটা বাহুল্য থেকেই যায়। অন্ততপক্ষে ঘরের খবরের সংবাদচিত্র মানে যেখানে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী মহোদয়দের বক্তৃতা, সভা ও তাদের যাতায়াত/মেলা উদ্বোধন, সেখানে বিদেশী সংবাদ-চিত্রে ইউরোপের সামান্য ঝড়ো হাওয়া বাদ যায় না। অথচ একই সময়ে রাজধানীতে অসংখ্য সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলেও তা টিভি দর্শকরা সংবাদচিত্রের মাধ্যমে দেখতে পান না। টিভি সংবাদের সময়ের স্বল্পতার কারণেই হয়তোবা বিদেশী সংবাদের আধিক্য ঘটে না, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিদেশী সংবাদ-চিত্র প্রদর্শন করে টিভি কর্তৃপক্ষ যেন তা পুষিয়ে নেয়। এর কারণ কি বন্দী মনোজগৎ, নাকি তার কোনো ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে।

বাংলাদেশে মনোজগতে উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে ইংরেজী কথিত বেস্ট সেলার বইয়ের প্রভাব কি রকম তা বোঝার জন্যে মহানগরী এবং প্রধান প্রধান শহরের ফুটপাতে সংবাদপত্রের স্টলগুলোর দিকে তাকাতে পরামর্শ দেবো। এদেশে যত সহজে হ্যারল্ড রবিন্সের বই পাওয়া যায়, আর্থার হেইলীর গ্রন্থ পাওয়া যায় তত সহজে একটি ক্লাসিক গ্রন্থ পাওয়া যায় কি? এয়ারপোর্ট, টাওয়ার, ডে অব দ্য জেকেল, ডকুমেন্ট আর, দ্য পাইরেট ইত্যাকার আধা-রাজনৈতিক মসল্লা জড়ানো, মনোহরণকারী প্রচ্ছদ শোভিত, হালকা মনোরঞ্জক এইসব বই আমাদের পাঠকদের ক্রমেই গভীর চিন্তাসমৃদ্ধ বই পঠনের অভ্যাস থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয় বিদেশী কমিকস আর শিশু কিশোর থ্রিলার গ্রন্থের রমরমা বাজার এদেশের প্রকাশকদেরও স্বল্প মূল্যের সে ধরনের বই প্রকাশের পথে টেনে এনেছে। আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যেও 'জনপ্রিয়' বেস্ট সেলার লেখার প্রবণতা এই হালকা মনোরঞ্জক রচনাগুলোর কাটতিই তৈরি করেছে। এ কথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই।

বাংলাদেশে কর্মরত অলাভজনক ফাউন্ডেশনগুলোর কাজ কি? আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করব। যখন দেশের ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজমান, একটিতে পুলিশী প্রবেশ নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছে, ছাত্ররা আরো বেশি সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংগ্রাম করছেন, ঠিক সে সময় ১৫ মার্চ '৮৭তে এশিয়া ফাউন্ডেশন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সহযোগিতা করছে ''বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা'' বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করতে। তার উদ্বোধন করতে গেছেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। 'নিজের

www.pathagar.com

মাটিতে সমাজতন্ত্রকে প্রতিরোধ করার কাজে সহযোগিতার' লক্ষ্য অর্জনের এর চেয়ে সহজ উপায় বোধ করি নেই।

বাংলাদেশের যে কোন দূর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির সূচনা হলে গোটা দেশের মানুষ যে সূত্রের ওপর সবচেয়ে আস্থা রেখে 'সত্য' খবর জানতে চায় তা হলো বিদেশী রেডিও বিশেষত বিবিসি ও ভোয়া। তার কারণ নিশ্চয়ই আছে, বিভিন্ন সময়ে আমরা আপাততদৃষ্টে তা পরীক্ষিত বলেও দেখেছি। কিন্তু বিবিসি বা ভোয়া এ ধরনের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি ছাড়া আমাদের দেশের উন্নয়ন সংবাদের কয়টা প্রচার করে, একবারও কি আমরা তা হিসেব করি? এ সকল সংবাদের পাশাপাশি ভোয়া ও বিবিসি'র বিশ্ব সংবাদ আমাদের বিশ্ব-দর্শনের যে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে দিচ্ছে তা কতটা যৌক্তিকতা, পাঠক মাত্রেই বিবেচনা করবেন।

আমাদের দেশের বিদেশী গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রায় সবাই একবার না একবার ইউসিস ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের অফিসে উপস্থিত হয়েছেন—টোয়েফেল, স্যাট, জিম্যাট, জি আর ই কিংবা ইএলটিএস পরীক্ষার জন্যে। কেননা ইংরেজী জানার প্রমাণপত্র ঐ পরীক্ষাগুলো। এ সকল পরীক্ষার সূত্রে আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতি বছর কত লক্ষ টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে, কোন্ ধরনের জ্ঞানরাজ্যের সাক্ষাৎ পাচ্ছেন তা সত্যি গবেষণার বিষয়। আর এদেশের সংবাদপত্র-গুলোতে ইউসিসের পাঠানো ফিচারের/নিবন্ধের ব্যবহার তো অবজারভার-এর ১-৭ মার্চের উপ-সম্পাদকীয়ের হিসেবেই আছে।

এ সব উদাহরণের তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়। আরো অনুপুঙ্খভাবে হিসেব উপস্থাপন অসম্ভব নয়। তা জরুরী ও প্রয়োজনও। কেননা সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলের এই অগ্রযাত্রা রুখতে না পারলে গিনি-বিসাউয়ের মুক্তি আন্দোলনের নেতা আমিলকার কাবরাল যে অবস্থার কথা বলেছেন তাই দাঁড়াবে আমাদের অবস্থা—আমাদের স্বাধীনতা মানে হয়ে দাঁড়াবে গাইবার মত একটি গান ও দোলাবার মতো একটি পতাকা মাত্র। আমরা নিশ্চয় তা চাই না?

রচনাকাল ঃ ১৯৮৭

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারী প্রতিমা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণ-মাধ্যমে নারী প্রতিমার স্বরূপ সন্ধান করতে হলে প্রথমে দু'টো বিষয়ে ধারণা নিয়ে নেয়া আবশ্যক বলে আমার মনে হয়। প্রথমত রাষ্ট্রের নিজস্ব চরিত্রটি কি, দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের পরিচালক শক্তি—সরকারের সাথে গণমাধ্যমসমূহের সম্পর্ক কি। আপাতদৃষ্টে এই দু'য়ের সাথে আলোচ্য বিষয়ের দূরত্ব থাকলেও রাষ্ট্রের নিজস্ব চরিত্র উপলব্ধি ব্যতিরেকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নিরূপণ দূরূহ এবং বোধকরি অসম্ভবও।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস তার ''পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি'' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ঐতিহাসিক দিক বিশ্লেষণ শেষে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, ''রাষ্ট্র মোটেই বাইরে থেকে সমাজের ওপর চাপিয়ে দেয়া একটি শক্তি নয়, সেই সঙ্গে, হেগেল যা বলতেন, 'নৈতিক ভাবের বাস্তবতা', 'প্রজ্ঞার প্রতিমা ও বাস্তবতাও' নয়। রাষ্ট্র হলো সমাজের একটি নির্দিষ্ট পর্বে বিকাশের ফল, রাষ্ট্র হলো এই স্বীকৃতি যে, সমাজটা অমীমাংসেয় স্ববিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, এমন আপসহীন বৈপরীত্যে ভেঙ্গে পড়েছে যা থেকে মুক্তি লাভে সে অক্ষম। এই বৈপরীত্যগুলো, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণীগুলো যাতে নিস্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও সমাজকে গ্রাস করে না বসে, তার জন্যে দরকার পড়েছিলো এমন একটি শক্তির যা দৃশ্যত সমাজের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান, যা সংঘর্ষকে নরম করে আনবে, তাকে 'শৃঙ্খলার' সীমানার মধ্যে ধরে রাখবে। সমাজ থেকে উদ্ভূত কিন্তু সমাজের ঊর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ক্রমেই বেশি করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা এই শক্তিই হলো রাষ্ট্র।''[১] এঙ্গেলস আরো লিখেছেন যে, ''রাষ্ট্রের উদ্ভব যেহেতু শ্রেণী বৈপরীত্য সামলে রাখার জন্য, অথচ রাষ্ট্র যেহেতু উঠছে ঠিক এই শ্রেণী সংঘাত থেকেই, তাই সাধারণত রাষ্ট্র হলো সবচেয়ে পরাক্রান্ত, অর্থনৈতিকভাবে প্রভুত্বকারী শ্রেণী এবং এইভাবে নিপীড়িত শ্রেণীকে দমন ও শোষণের নতুন উপায় হাতে পায় .... শুধু এই নয় যে কেবল প্রাচীন ও সামন্ত রাষ্ট্রগুলোই ছিল ক্রীতদাস ও ভূমিদাস সংস্থা, আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হল পুঁজি কর্তৃক মজুরি শ্রম

www.pathagar.com

শোষণের হাতিয়ার।''২ এঙ্গেলস রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেছেন, ''তাই, রাষ্ট্র রয়েছে চিরকাল থেকে নয়। এমন সমাজ ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলেছে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ক্ষমতার ধারণাও তাদের ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমাজের ভাঙ্গনের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িত, সেই মাত্রায় এই ভাঙ্গনের ফলে রাষ্ট্র আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এখন দ্রুতপদে উৎপাদন বিকাশের এমন একটা পর্যায়ের কাছে যাচ্ছি যখন এইসব শ্রেণীর অস্তিত্ব আর আবশ্যক থাকছে না। শুধু তাই নয়—উৎপাদনের সোজাসুজি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে শ্রেণীর উদয় যেমন ছিল অনিবার্য, তেমনি অনিবার্যই হবে তাদের লুপ্তি। শ্রেণী লোপের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবেই লোপ পাবে রাষ্ট্র। উৎপাদকের মুক্ত ও সমাধিকারী সমিতির ভিত্তিতে নতুনভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠাবে সেইখানে, যেটা হবে তখন তার যোগ্য স্থান ঃ চরকা ও ব্রোঞ্জ কুঠারের পাশে পুরাবস্তুর যাদুঘরে।''৩

রাষ্ট্র সম্পর্কে এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক ধারণা প্রমাণ করছে যে, রাষ্ট্র হলো শ্রেণী-বিরোধের অমীমাংসেয়তার ফল এবং নিপীড়িত শ্রেণীকে শোষণের হাতিয়ার। এই রকম একটি প্রতিষ্ঠান, যার উদ্ভব ঘটেছে বলভিত্তিকরূপে এবং শেষাবধি যা প্রেরিত হবে যাদুঘরে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি উপরিকাঠামোর প্রতিষ্ঠানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী কি সহজেই বোঝা যায় না? তবে এটাও মনে রাখা আবশ্যক যে, রাষ্ট্র নিজেই সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে না; নিয়ন্ত্রণের জন্যে রয়েছে তার নিজস্ব কাঠামো, যা হচ্ছে সরকার। সেই সরকারের সাথে গণ-মাধ্যমগুলোর সম্পর্ক কি? গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ফ্রেড এস সিবার্ট সরকার ও গণমাধ্যমের সম্পর্ককে ৪ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর ধারণায় সরকার গণমাধ্যমের ওপর restrictive agency, regulating agency, facilitating agency এবং participating agency হিসেবে কাজ করে। সিবার্ট তাঁর ''কমিউনিকেশনস এণ্ড গভর্নমেন্ট''৪ নিবন্ধে দেখিয়েছেন এই ভূমিকা- সমূহের মধ্যে চীনের প্রাচীর তোলা নেই, উপরন্ত একই সরকার একই সময়কালে আপাতবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে/হয়। সাধারণভাবে একথা বলা দূরূহ নয় যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণমাধ্যমসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শেষোক্ত দুই ভূমিকার (facilitating agency, participating agency) চেয়ে প্রথমোক্ত দুই (restrictive ও regulating) ভূমিকাই মুখ্য। এই ধারণার অনুকূলে সমর্থন মেলে আরমাদ মাতেলা ও সিথ সিগেলাবের সম্পাদিত গ্রন্থ 'কমিউনিকেশন এণ্ড ক্লাস স্ট্রাগল' গ্রন্থের দুই ভল্যুমে রচনাবলীতে।

www.pathagar.com

রাস্ট্র সম্পাকিত ধারণা এবং সরকার ও গণমাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদেরকে স্পষ্টতই এ ধারণা দেয় যে, নিপীড়ক কাঠামোর অনুবর্তী বা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত মাধ্যম কাঠামোর নিজস্ব চরিত্রকে অতিক্রম করে যায় না; বরং ঐ কাঠামোকে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই সত্য অনস্বীকার্য যে, কোন পেশা, গোষ্ঠী বা জনসমষ্টির প্রতিমা-নির্মাণের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবার বাহ্যত কোন কারণ নেই।

এই সাধারণীকরণের আলোকে আমরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমে নারী-প্রতিমা প্রসঙ্গটি দাঁড় করাতে পারি। বাংলাদেশ—যার ৫৫ হাজার ৫শত ৯৮ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রায় ১০ কোটি লোক বাস করে, মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ গ্রামের অধিবাসী, শতকরা ২৪ ভাগ লোকের অক্ষর জ্ঞান আছে, মাথাপিছু আয় ১২০ ডলার, ১০ হাজার লোকের জন্যে ১ জন চিকিৎসক, শিশুদের শতকরা ৬৫ ভাগ অপুষ্টিতে ভোগে, প্রায় ৬০ শতাংশ পরিবার ভূমিহীন, ৩০ শতাংশ শ্রমিক কর্মহীন, জনগণের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ ন্যূনতম ক্যালোরী গ্রহণের হিসেবে দারিদ্র সীমার নীচে।[৬] দারিদ্র, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা ও বেকারত্ব যে-জাতির প্রধান সমস্যা সে-জাতির প্রধান লক্ষ্যবস্তু কিন্তু ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে এই মানবেতর জীবন থেকে রক্ষা নয়। প্রায় সকল অর্থনীতিবিদই অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করেছেন যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য ধনিক গোষ্ঠী তৈরি এবং পরিকল্পনা ক্রমান্বয়ে গোটা দেশের অধিকতর জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র-সীমার নীচে ঠেলে দেয়।[৭] এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাধীনে সংগতভাবেই গণমাধ্যমগুলো ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের স্বরূপ প্রতিফলনে উপযোগী নয়। ফলে গোটা দেশের জনগোষ্ঠীর বিকৃত প্রতিমা নির্মাণে এই গণমাধ্যমগুলো অধিক পারঙ্গম। তদুপরি এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হতে সামাজিক কাঠামো নারীকে সম-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না করে, তাকে পুরুষাধিপত্যে অধীন রাখে/রাখতে চায়। এই সমাজে নারীর কাজ হয়ে দাঁড়ায় জৈবিক পুনরুৎপাদনের ভূমিকা পালন। সামাজিকভাবে. তার পশ্চাদপদতার কারণ হিসেবে 'সংস্কারক'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণরা বড় জোর 'ভূমিহীন ও যুবকদের মতো' সামাজিকভাবে বঞ্চিত গোষ্ঠী হিসেবে নারীকে বিবেচনা করেন এবং কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন 'নিজের অবস্থান সম্পর্কে অসচেতনতাকে'। বিভ্রান্ত নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে নারীকে অধস্তন প্রমাণের প্রচেষ্টা প্রায় সব সময়ই দৃষ্ট হয়। সমাজে উপস্থিত এ সকল দৃষ্টিভঙ্গিই গণমাধ্যমসমুহে পরিস্ফুটিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তার প্রমাণ সংবাদপত্র,

www.pathagar.com

রেডিও, টিভি, সিনেমা সর্বত্রই সহজে দৃষ্ট। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন গণমাধ্যমসমূহের অন্যতম দুটো ইলেকট্রনিক মাধ্যম—রেডিও টেলিভিশনের দিকে তাকানো যেতে পারে।

আমাদের দেশের গণমাধ্যমসমুহের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানমালার এক ব্যাপক অংশই হচ্ছে বিদেশী ছায়াছবি। এ সকল ছায়াছবির কাহিনী আবর্তিত হয় এক সুপারম্যানকে ঘিরে। স্বাভাবিক মানবিক মেধা, শ্রম ও অনুশীলন দ্বারা অর্জিত নয়। বরং অলৌকিকভাবে অর্জিত এ সকল গুণের সমাহারে সমস্যা সমাধান হয়ে পড়ে অত্যন্ত সহজ। মানুষের এসব সমস্যা সামাজিক বা অর্থনৈতিক নয়—এটা প্রমাণই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে নারী কেবলমাত্র নিষ্পাপ সুন্দরী কিংবা রহস্যময়ী প্রেমিকা, বড় জোর অপনায়িকা (ভ্যাম্প)। ১৯৮১ সালের অনুষ্ঠানের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায় টেলিভিশনের একটি চ্যানেলে এ ধরনের অনুষ্ঠানের পরিমাণ শতকরা ৩৯ দশমিক ৬৫।[৮] দুটি চ্যানেল মিলিয়ে তার পরিমাণ শতকরা ৪৭ দশমিক ৩৪।[৯] ১৯৭৮ সালের অনুষ্ঠানের আধেয় বিশ্লেষণে তার পরিমাণ ছিল ২৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। ১৯৭৬ সালে ৩৩ দশমিক ৮২। ১৯৭৫ সালে ৩৬ দশমিক ৩১। ১৯৭৪ সালে ৩৬ দশমিক ৩০। ১৯৭৩ সালের ৩৯ দশমিক ৪৩। ১৯৭০ সালে ৪৩ দশমিক ৫৮ এবং ১৯৬৬ সালে ৪১ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

বিদেশী অনুষ্ঠানাদিতে, বিশেষত চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত নারী প্রতিমা সংগত কারণেই আমাদের ব্যাপক নারী জীবনের প্রতিফলক নয়। বরং তার অনিবার্য কুফল হচ্ছে অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার উন্মোচিত হওয়া, নারীকে সামাজিকভাবে আপন সংগ্রামী ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। লক্ষণীয় এই যে, উল্লেখিত গবেষণা কর্মের সূত্রে ১৯৬৬ থেকে ১৯৮১ এই পনেরো বছরে প্রদর্শিত বিদেশী চলচ্চিত্রসমূহের আধেয় বিশ্লেষণ করে আমি এই তথ্য লাভ করে বিস্মিত হই যে, যে সকল ক্ষেত্রে নারীকে 'মর্যাদাবান' করার চেষ্টা হয়েছে সে ক্ষেত্রেও তাকে দেখানো হয়েছে বিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে। সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্যে উপস্থিত থেকে নারীকে 'মর্যাদাবান' করার চেষ্টা হয়নি। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের এই বিচ্ছিন্ন প্রয়াস করুণ পরিণতিতে পৌঁছেছে। এই একই সময়কালে স্থানীয়ভাবে যে সকল অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে তাদের বিনোদন-মুখ্যতার কথা প্রথমেই বলে নেয়া দরকার। নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, গান টেলিভিশন অনুষ্ঠানের বড় আকার দখল করে রেখেছে। নারীদের জন্যে নির্ধারিত অনুষ্ঠানের পরিমাণ হিসেব করা যাক। ১৯৬৬ সালের ১-৭ মার্চ ঢাকা টেলিভিশনে প্রচারিত ১০৮০ মিনিটের অনুষ্ঠানের মধ্যে সাকুল্যে ২৬ মিনিট অর্থাৎ ১ দশমিক ৪৮ শতাংশ নারীদের জন্যে ব্যয়িত

www.pathagar.com

হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে রন্ধন শিল্প, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা ছিলই মুখ্য। ১৯৭০ সালের ৩-৯ নভেম্বরের ১৫৭২ মিনিটের অনুষ্ঠানমালায় নারীদের কোনো অনুষ্ঠান ছিলো না। ২৬ ডিসেম্বর,৭৩—১ জানুয়ারি,৭৪ মোট ১৫৮৫ মিনিট অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে, তার মধ্যে ২৫ মিনিট নারীদের জন্যে বরাদ্দ থেকেছে। ১২-১৮ জানুয়ারি '৭৪ মোট ১৫১৫ মিনিটের মধ্যে ২০ মিনিট নারীদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। ১৩-১৯ শে মে,'৭৮ ২১৩৫ মিনিটে ১০৫ মিনিট নারীদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু ১৯৮১ সালের ১৬-১২ মার্চ ৪৫০০ মিনিটে ১ মিনিটও বরাদ্দ হয় নি। সময়ের এই অপ্রতুলতাই শুধু নয়; আধেয় বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, রন্ধন-বুনন-গৃহব্যবস্থাপনা শিশু পালন ছাড়া নারীদের সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে কোনো ভূমিকা নির্দেশের চেষ্টা এখানে নেই। এগুলোতে একদিকে যেমন নারীকে গৃহবন্দী করার চেষ্টা আছে, তেমনি ভিন্ন দিকে অপরাপর অনুষ্ঠানে নারীকে দেখানো হয়েছে 'পরনির্ভরশীল' সত্তা হিসেবে। নাটক এ বিষয়ে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছে। উপস্থিত সকলের স্মৃতিতে জাগরূক সাম্প্রতিককালে টেলিভিশনের তিনটি সিরিজ নাটক ঃ সকাল-সন্ধ্যা, এইসব দিনরাত্রি এবং প্রতিশ্রুতির কথাই বলা যাক। সকাল-সন্ধ্যার কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র শিমু কেবলমাত্র বড় লোক পিতার কন্যা এবং মধ্যবিত্ত স্বামী শাহেদের স্ত্রী। তার নিজস্ব চরিত্র লুপ্ত হয়ে গেছে, চাকরি করার প্রচেষ্টায় সে ব্যর্থ হয়েছে এবং শেষাবধি সন্তান প্রতিপালন ভিন্ন কোনো কাজে ভূমিকা রাখতে পারেনি।

অপর চরিত্র শাকেরা শেষাবধি লম্পট ও চরিত্রহীন স্বামীর পদতলেই আপন বেহেস্ত খুঁজে পেয়েছে। শিক্ষা ও সচেতনতা উভয়েরই কম ছিলো না; কিন্তু শেষ বিচারে তারা আপন বৃত্তে বন্দী। কেননা এর চেয়ে বড় ভূমিকা ''সমাজ'' নারীকে দেয় না।'এইসব দিনরাত্রির' নিলুভাবী সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো— সমস্ত রকম বেদনাকে ধারণ করে স্বামী-দেবরের ফাই পরমাশ খাটে এবং শাশুড়ীর গঞ্জনা সয়। কিন্তু সে 'গৃহবধু' অতএব সবই সহ্য করতে হয়। নিরুপায় নারীর শেষ পরিণতি তাই। যেমনটি ঘটেছে অপর নারী চরিত্র শারমিনের ক্ষেত্রে। কেবলই বিচ্ছিন্নতা (alienation) তাকে নিয়ে গেছে নিজের একার জগতে। আত্মকেন্দ্রিকতাই কি শেষ আশ্রয়? নাকি বিচ্ছিন্নতাই শেষ পরিণতি নারীর জন্যে? প্রতিশ্রুতি'র নায়িকারা পলায়নপর একজন পুরুষের কাছ থেকে, সমাজের কাছ থেকেও। শুকতারা'র রচয়িতা হয়তো এই আলোচনায় প্রীত বোধ করবেন যে, তার নাটকের নারী চরিত্রগুলো ''স্বাধীন'', ''শ্রমজীবী'' ও ''সমিতি করে'', সর্বোপরি ''লম্পট'' স্বামীকে ত্যাগ করতে অকুণ্ঠিত, কিন্তু তাতে আত্মতৃপ্তি

www.pathagar.com

মিললেও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো ভূমিকা রাখে না। আরোপিত 'নারী স্বাধীনতা' ঐ নারীবহুল নাটকের চরিত্রগুলোকে সমাজ-বৃত্তে বন্দী অসহায় বলে প্রমাণ করেছে এবং নারীর মর্যাদা যে শেষাবধি সামাজিক রূপান্তরের সাথে যুক্ত তা কোনোভাবেই বলা হয়নি। কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না এমনকি 'সময়-অসময়ের' নাট্যকারও। সামাজিক দ্বন্দ্ব তিনি যতটা কৃতিত্বের সাথে তুলে ধরেছেন, নারীর ভূমিকাকে ততটা নয়। হিন্দু নারী বৌদি পাগলা মধু'র ব্যথায় ব্যথিত, অন্যকে আশ্রয় দিতে আগ্রহী কিন্তু প্রতিরোধে উৎসাহী, সামাজিক রূপান্তরে? 'আমি, তুমি, সে' বলে যে সিরিজ নাটকটি প্রচারিত হয়েছিল তার কথা না হয় বাদই দিলাম। কেননা নারী এই সমাজে কেবলই পণ্য আর কিছু নয় এটা প্রমাণের জন্যে টিভির এই নাটক প্রচারের প্রয়োজন ছিলো না। প্রতিদিনের অসংখ্য বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট। যদিও ১৯৮২ সালের ১ মার্চ টেলিভিশন বিজ্ঞাপন নীতিমালায় এই ধারা যুক্ত করা হয়েছে যে, ''বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের যৌন প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না'' এবং ''মাধ্যমটিকে নারীদের স্ট্যাটাস বৃদ্ধিতে ব্যবহার করতে হবে ও তাদের শিক্ষা ও কর্মের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করতে হবে।'' তথাপি টিভি বিজ্ঞাপন চিত্রে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নারী মুখ ও দেহ ব্যবহারের কারণ কে না বুঝতে পারে। বিজ্ঞাপনমাত্রই নারীদেহ সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। এটা কি টিভি অস্বীকার করতে পারবেন? তবে একথাটি টিভি কর্তৃপক্ষ না বললেও আমরা জানি যে, যে সমাজে নারী প্রকৃতই পণ্যমাত্র টিভির চিত্রে তার অন্যথা ঘটে না/ ঘটতে পারেও না।

রেডিও বাংলাদেশের অনুষ্ঠানমালায় নারীর অবস্থান কি? মেঘনা গুহঠাকুরতা এক জরিপে দেখিয়েছেন রেডিও বাংলাদেশের মোট প্রচার সময়ের অর্থাৎ সপ্তাহে ১১৯ ঘণ্টার প্রায় শতকরা ৭ দশমিক ৫৬ ভাগ যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তার মূখ্য ভূমিকা নেয় নারী।[১০] এর কারণ অবশ্য নারীকে গুরুত্ববহভাবে উপস্থাপন নয়, সহজে নারীকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ভোক্তায় রূপান্তর সম্ভব বলে। ঘরের পুরুষের চাপের সাথে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের চাপ একত্রে যাতে অব্যাহত রাখা যায়। অর্থাৎ মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা, অধস্তন রাখা। বারংবার পরিবার পরিকল্পনার বিজ্ঞাপন মনে করিয়ে দেয় যে, জন্ম দান ব্যতীত নারীর দ্বিতীয় ভূমিকা প্রায় নেই-ই। নারীকে যে সমাজ রূপান্তরের কর্মে ভূমিকা রাখতে হবে এই সত্য এমন কি নারীদের জন্যে বরাদ্দের সাপ্তাহিক আধা ঘণ্টার অনুষ্ঠানেও (মোট সময়ের শতকরা ২ দশমিক ৯৪) উচ্চারিত হয় না। এসব অনুষ্ঠানে বড় জোর বেগম রোকেয়াই হচ্ছেন আদর্শ, কেননা তিনি 'শিক্ষার' বিস্তার চেয়েছিলেন। এর বাইরে বেগম রোকেয়ার কোন ভাবমূর্তিই

www.pathagar.com

যেনো নেই।

এই দুই ইলেকট্রনিক মাধ্যমের বাইরে যে সকল গণমাধ্যম রয়েছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে তার মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম। তবে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র পুঁজির করতলগত বলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সংবাদপত্র এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রাণাধীন সংবাদপত্রের মৌল চরিত্রে কোন পার্থক্য ঘটে না। একে অপরের পরিপূরক হিসেবেই কাজ করে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূচনায় আমি যে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধের চেষ্টা করেছিলাম সেখানে ফেরা যেতে পারে। আর তা হলো রাষ্ট্রের চরিত্র প্রসঙ্গ। রাষ্ট্র নিজেই যেখানে নিপীড়ক, তার অধীন প্রতিষ্ঠান সরকার অনুগামী এবং ফলত তার নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন মাধ্যমই স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্যেই সক্রিয়। বাংলাদেশের গণ-মাধ্যমে নারীর প্রতিমা (image) যে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপিত, তার অন্যতম কারণ সেটাই। কেবল নারীই নয়, যে কোন গোষ্ঠীর জন্যেই তা প্রযোজ্য। তবে ব্যতিক্রম এই যে, নারী নিপীড়িত দু'ভাবে—এক, সে এই নিপীড়ক সমাজের বাসিন্দা বলে, দুই, এই নিপীড়ক সমাজের ভেতরে পুরুষেরা তাদের অধস্তন রাখতে চাইছে বলে। এই দু'য়ের বিরুদ্ধেই নারীকে উচ্চকিত হতে হবে। এবং শেষাবধি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে উচ্ছেদ করতে হবে। তার পথ অজানা নয়, অচেনা নয়। সেই লক্ষ্যেই আমাদের সক্রিয় হতে হবে।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১. ভ.ই.লেনিন, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, চতুর্থ সংস্করণ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮০ পৃঃ ৮

২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪

৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭

৪. উইলবার স্যাম সম্পাদিত,''ম্যাস কমিউনিকেশন'', ইলিনয় প্রেস, যুক্তরাষ্ট্র. দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯, পৃঃ ২১৯-২৬

৫. Armand Mattelart, Seth Siegelaub, Communication and Class Struggle, IG/IMMRC,New York.1983

৬.আবদুন নুর, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন , সমাজ নিরীক্ষণ, ১৬, মে ১৯৮৫, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা,পৃঃ ১০৭

৭.নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন ধারার কতিপয় মৌল বৈশিষ্ট্য ঃ একটি সমীক্ষা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, অক্টোবর, ১৯৮৬

৮. আলী রীয়াজ, এম, এ'র কোর্স পূরণের জন্যে গবেষণা, অপ্রকাশিত,১৯৮২

৯. পূর্বোক্ত

১০.মেঘনা গুহঠাকুরতা, বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও নারী সমাজ, সমাজ নিরীক্ষণ/২২, নভেম্বর '৮৬,সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, পৃঃ ১

রচনাকাল ঃ ১৯৮৭

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধী আইন

বাংলাদেশে বর্তমানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে বহুভাবে বিঘ্নিত এবং প্রকৃতপক্ষে অনুপস্থিত একথা কমবেশি সকলেই অবগত আছেন। অসংখ্য সংবাদ সাপ্তাহিকের ছড়াছড়ি দৃষ্ট হলেও স্বাধীনভাবে কথা বলা যে কতটা দুস্কর তা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংবাদপত্রের তালিকার দিকে তাকালেই বোঝা যায় (সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, ইত্তেহাদ, বিচিত্রা, জয়যাত্রা, রোববার এবং দৈনিক বাংলার বাণী বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়েছে যা পরে প্রকাশনার ছাড়পত্র পেয়েছে। সংবাদপত্রসেবীদের অনেকেই একথাও জানেন যে, কোনো কোনো মন্তব্যের জন্যে সংবাদপত্রকে নিষেধাজ্ঞার দোরগোড়া থেকে ক্ষমা চাইবার বিনিময়ে ফিরে আসবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালের এ সকল ঘটনাবলী থেকে একেবারে নির্ভেজাল সংবাদপত্র অনুৎসাহী ব্যক্তিও এমন কথা বলবেন না যে, সংবাদপত্র দলনের ঘটনা নতুন বা বিগত কয়েক বছরের কীর্তি মাত্র; বাংলাদেশের মানুষ যতদূর পর্যন্ত তাদের স্মৃতিকে প্রসারিত করতে পারবেন ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত করলেও এ কথা প্রায় ধ্রুব সত্যের মতোই উচ্চারণ করা সম্ভব যে, আমাদের দেশে সংবাদপত্রের ওপর 'নিয়ন্ত্রণ' উপস্থিত ছিলো। সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া, সম্পাদককে দেশত্যাগী করানো, বিচারের মুখোমুখি করা, সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করা, সংবাদপত্র কার্যালয়ে হামলা করানো, সংবাদপত্র মালিককে জেল-জরিমানা করা এ সকল ঘটনা বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। এ দেশে সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের পথ এবং তার ওপর দলন-নিপীড়ন সমান্তরালভাবেই প্রবাহিত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক সত্য উচ্চারণের সময় আরো দু'টি বিষয় উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। সেগুলো হলো ঃ সংবাদপত্রের ওপর এই ধরনের নিপীড়কমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সচেতন সাংবাদিক, সংবাদপত্রসেবী এবং সাধারণ জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রচেষ্টা; এবং দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে নতুন নতুন ব্যবস্থা ও কৌশলের আবির্ভাব। সংবাদপত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে বল প্রয়োগই ছিলো প্রধান কণ্ঠরোধী প্রয়াস: সময়ের বিবর্তনে

www.pathagar.com

বলের স্থান দখল করেছে কৌশল—এক সময় যা ছিলো 'বে-আইনী'ভাবে নিপীড়ন ক্রমান্বয়ে তা হয়ে উঠেছে 'আইনী', 'বিধি-সম্মত'। সংবাদপত্রের ওপর দলন-নিপীড়ন ও তার কণ্ঠরোধের জন্যে খড়গহস্ত শক্তি সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের প্রাথমিক লগ্ন থেকেই দু'ধরনেরঃ মালিক ও সরকার। সংবাদপত্র, বিশেষত সাংবাদিকদের স্বাধীনতা এ দুই খড়গের নীচে সব সময়ই বলির পশুর মতো সদা কম্পমান থেকেছে। তবে আজকে আমরা আলোচনা করবো এর মধ্যকার একটিকে নিয়ে ঃ সরকার—যারা আইন তৈরি করেন এবং আইন প্রয়োগ করেন।

বাংলাদেশের গত কয়েক'শ বছরের ইতিহাসে সরকারের বহুবিধ ধরনের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানী প্রায়-উপনিবেশিক শাসন, স্বাধীন বাংলাদেশে বহু দলীয় 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থা, একদলীয় শাসন, সামরিক শাসন—ইত্যাকার বহু ধরনের শাসন ব্যবস্থার অধীনেই বাংলাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সরকারের রূপ ও চরিত্রের এতো ব্যাপক পরিবর্তন সত্ত্বেও সংবাদপত্রের ওপর নিপীড়নের শেষ হয় নি, বরং বিভিন্ন আকার-প্রকারে হাজির হয়েছে এবং ''আইনী'' পদ্ধতিতেই তা ঘটেছে। বাংলাদেশেও আজ এ ধরনের বহু কৌশল ও আইন রয়েছে যা সদা সর্বদা সংবাদপত্রকে রক্তচক্ষু শাসন করছে যেনো তা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের বাহন হয়ে না ওঠে। আজকের এই আলোচনায় আমি সে সকল আইনের প্রতিই মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করবো। তবে তার পটভূমি হিসেবে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী আমলের এই ধরনের আইনের উল্লেখ করেই আমি সেই পর্বে প্রবেশ করবো।

এখানে আরো একটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তা হলে এই অবস্থা/ব্যবস্থার কারণ কি ? গোটা আলোচনার শেষে আমি আমার ব্যক্তিগত দু'একটি মন্তব্য হাজির করবো। এ সকল মন্তব্য অবশ্যই চূড়ান্ত নয়, তবে আশা করি তা এই বিষয়ে সামান্য হলেও ভাবনা চিন্তার সূচনা করতে পারবে।

ব্রিটিশ আমল

এই উপমহাদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালে, যাকে আমরা হিকীর গেজেট বলে জানি। 'বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার' পত্রিকাটি যখন প্রকাশিত হয় সে সময়টিতে সংবাদপত্র বিষয়ে তৎকালীন শাসকদের কোনো আইন ছিলো না। কিন্তু এই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ তাদেরকে এতটাই উত্তেজিত করে তোলে যে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে সরকারী মহলে। প্রাথমিকভাবে

www.pathagar.com

এই পত্রিকাটি বঞ্চিত হয় পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সংবাদপত্র বিতরণের সুবিধাটি থেকে এবং পরবর্তীকালে মালিক-সম্পাদক জেমস অগাস্টাস হিকীকে মানহানি ও দুর্নাম রটানোর মামলায় জড়ানো হয়। হিকী এই নিগ্রহ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে সংবাদপত্র জগৎ থেকে সরে দাঁড়ান।

হিকীর এই করুণ পরিণতির পর উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের সংবাদপত্রের মালিকরা সংবাদপত্রের উপর সরকারী হস্তক্ষেপকে মেনে নিতে থাকেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাইর মালিকরা যতদূর পর্যন্ত এই হস্তক্ষেপ মেনে নেন যে, 'মাদ্রাজ গেজেট' কাগজটি সরকারের সামরিক সচিব কর্তৃক প্রি-সেন্সরসীপ মেনে নিয়েই প্রকাশ করা হতো (এক পর্যায়ে অবশ্য এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করলে পত্রিকাটি ডাক সুযোগ বঞ্চিত হয়)। কলকাতার উইলিয়মে ডুয়েন তা মেনে না নিয়ে 'বেঙ্গল জার্নাল' প্রকাশ করলে তার ওপর সরকারী নিবর্তন এতটাই বৃদ্ধি পায় যে এক পর্যায়ে তার গৃহ তল্লাসী এবং তছনছ পর্যন্ত করা হয়। শেষাবধি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয় ইংল্যান্ড।

এ সকল ঘটনা থেকে তৎকালীন সরকার উপলব্ধি করেন যে, সংবাদপত্রের ওপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রণীত না হলে এ ধরনের সমস্যাদি মোকাবেলা ক্রমান্বয়েই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এই প্রেক্ষাপটেই মারকোয়েস্ ওয়েলসলী ১৭৯৯ সালে সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে সংবাদপত্রে মুদ্রণকারী, প্রকাশক ও সম্পাদক-এর নাম প্রকাশের জন্যে বিধান রাখা হয়। এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য সকল কিছু সরকারের কাছে পাঠাবার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়। আইনে বিধান রাখা হয় যে, এই আইন অমান্যকারী ব্যক্তিকে ভারত থেকে বহিস্কার করা হবে। এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখারও একটা কারণ ছিলো। এ সময় পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত সকল সংবাদপত্র মালিক/সম্পাদক/ প্রকাশকই ছিলেন অ-ভারতীয় ইংরেজ। সংবাদ-পত্রের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক এই আইনটি কিছুদিনের মধ্যেই অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয় দু'ভাবে। প্রথমত, সরকারের কাছে আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে এমন কিছু পত্রিকা, মালিকরা পত্রিকায় না ছেপে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে থাকেন। দ্বিতীয়ত মর্নিং পোস্ট নামধেয় একটি সংবাদপত্র সম্পাদক তার মা ভারতীয় এই সূত্রে নিজেকে ভারতীয় দাবি করে বলেন যে এই আইন তার জন্যে অকার্যকর। ফলে হেস্টিংসের আমলে এসে প্রি-সেন্সরশীপ এবং ওয়েলসলীর রেগুলেশন উভয়ই কার্যত অকার্যকর প্রমাণিত হয়। ফলে তা বাতিল হয়ে যায়।

হেস্টিংস এই সকল 'বিধি বিধান বাতিলের সময় সরকার ও জনস্বার্থ বিরোধী সংবাদ/মন্তব্য প্রকাশের সময় আরো দায়িত্বসম্পন্ন

www.pathagar.com

ভূমিকা পালনের জন্যে সম্পাদক/মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন বটে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের জন্যে যা দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন তা তৎকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদের জন্যে নয় বলেই অচিরেই এই প্রশ্নে দুপক্ষের বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষত রাজা রামমোহন রায়-এর মত সমাজ সংস্কারক যখন সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচলিত ধর্মবোধ, সংস্কার এবং কথিত ''জনস্বার্থ''কেই আঘাত করতে থাকলেন তখন এই দ্বন্দ্ব প্রকটতর রূপ লাভ করতে থাকলো। এই পটভূমিকায় জন এ্যাডাম নতুন আইন প্রণয়ন করে (১৮২৩) সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ব্যতিরেকে সকল কিছুই সরকারের গোচরীভূত করার এবং গভর্নর জেনারেলের লাইসেন্সের অধীনে আনার ব্যবস্থা করলেন। এই আইন মোতাবেক সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যে লাইসেন্সের বিধান চালু হলো এবং তার জন্যে সকল সংবাদপত্রকে মুদ্রণকারীর নাম, প্রকাশকের নাম, মালিকের নাম, তাদের ঠিকানা, ছাপাখানার নাম ও স্থান এবং সংবাদপত্রের নাম জানিয়ে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে বলেও নির্দেশ দেয়া হলো। এও জানানো হলো যে, এর যে কোন একটি পরিবর্তনের জন্যে দরকার হবে নতুন লাইসেন্সের। সর্বোপরি গভর্নর জেনারেল চাইলেই এই লাইসেন্স বাতিল করতে পারবেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা প্রদান করা হলো যে, কোনো সংবাদপত্রের লাইসেন্স বাতিল হবার পরও তা প্রকাশনা অব্যাহত রাখলে তার সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করার। সকল পত্রিকাকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, যে সকল তথ্য তারা সরকারকে লাইসেন্স গ্রহণ কালে সরবরাহ করেছেন তা প্রতি সংখ্যায়ই মুদ্রণ করতে হবে। এ্যাডামস রেগুলেশন বলে খ্যাত এই সকল আইনের সাথে আজকের বাংলাদেশে প্রচলিত ডিক্লারেশন পদ্ধতি মর্মার্থেই কেবল নয় পদ্ধতিগতভাবেও এক ও অভিন্ন। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ওপর বহাল এই আইনে প্রত্যেকটি সংখ্যার এক কপি যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছুবার ব্যবস্থা ছিলো আজকের দিনে সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে কপি পৌঁছুবার ব্যবস্থা তারই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

জন এ্যাডাম-এর এই নিবর্তনমূলক অধ্যাদেশ দীর্ঘদিন উপমহাদেশের সংবাদপত্রসমূহের ওপর খড়গহস্ত হয়ে শাসাতে থাকে। এতে করে প্রাথমিক পর্যায়ে সংবাদপত্রের বিকাশের যে ধারার সূচনা হয়েছিলো তা ক্রমান্বয়েই শুকিয়ে যেতে থাকে। তা ছাড়া সাধারণের মধ্যে ধূমায়িত ক্ষোভ-বিক্ষোভ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে সরকারের পক্ষে তার রূপ ও চরিত্র সম্পর্কে অনুমান ও ধারণা করাও সম্ভব বলে এক পর্যায়ে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে এই উপলব্ধি ঘটে যে সংবাদপত্রের ওপর থেকে আইনের এই কড়াকড়ি শিথিল করা আবশ্যক। এই সময়কালেই চার্লস ম্যাটকাফে (১৮৩৫) গভর্নর

www.pathagar.com

জেনারেল হিসেবে ভারতে আগমন করেন। লর্ড ম্যাকলের পরামর্শে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইনগুলো বাতিল করে একটি সমন্বিত এবং সর্ব–ভারতীয় সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ওপর ম্যাটকাফে গুরুত্ব আরোপ করেন। এই উদ্দেশ্যেই বেঙ্গল রেগুলেসন্স এ্যাক্ট ১৮২৩, বোম্বে প্রেস রেগুলেশন্স ১৮২৫ ও ১৮২৭ বাতিল ঘোষণা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল এলাকার জন্যে প্রবর্তিত হয় নতুন আইন। এই আইনে (১৮৩৫) প্রকাশক ও মুদ্রণকারীকে প্রকাশনার স্থান সম্পর্কে সরকারকে জানানোর জন্যে নির্দেশ দেয়া হলেও প্রি–সেন্সরসীপ প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হয়। (আমি এখানে একটি বিষয়ে সকলকে একটু গভীরভাবে নজর দিতে অনুরোধ করব; তা হলো এই সর্বভারতীয় আইন প্রণয়ন এবং তাতে খানিকটা উদারনীতি অবলম্বনের জন্যে পরামর্শদাতা ব্যক্তিটি কে তাঁর প্রতি। তিনি হলেন লর্ড ম্যাকলে। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করে শাসক অনুগত বশংবদ শ্রেণী সৃষ্টির জন্যে পরামর্শ প্রদান করে যিনি এক 'ঐতিহাসিক' ভূমিকা পালন করেছেন, সেই ম্যাকলেই সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও এই উদারনীতিকতার ধারক। যদিও এমত ধারণা অনেক গবেষকই করেন যে, ম্যাটকাফের এই সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়, তাঁরাও বিস্মৃত হন বা তলিয়ে দেখেন না যে, এর পেছনে পরামর্শদাতা ম্যাকলের ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয় কিংবা তা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবের সাথে অভিন্নই।)

মেটকাফের উদারনীতিক আইন ১৮৫৭ সালের 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ' পর্যন্ত বহাল ছিলো। এর মধ্যে কেবল একটি নতুন বিষয় সংবাদপত্র জগতে আবির্ভূত হয় যা সরাসরিভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রের প্রতি সরকারী উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গির সুযোগে সরকারী কর্মকর্তারা কোনো কোনো সংবাদ/তথ্য সংবাদপত্রের হাতে তুলে দিতে উদ্‌যোগী হলে সরকার অনুভব করেন যে, তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রা থাকা জরুরী। এই প্রেক্ষাপটে সরকারের কি খবর সংবাদপত্রে যাবে আর কি যাবে না তা সরকারী কর্মচারীদের জানিয়ে দেন। (সম্ভবত এই মন্তব্য করলে অতিশয়োক্তি হবে না যে, সরকারী প্রচারণার ধারণার সূচনা সেখানেই এবং আজকের বাংলাদেশে প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টিমেন্ট বা PID বলে কথিত সরকারী তথ্য দফতরের ধারণার উৎসমুখও এটি। (এই তথ্য দফতরের বর্তমান ভূমিকা নিয়ে আমরা পরে দু'একটা কথা বলবো।)

১৮৫৭ সালে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হলে জারি করা হয় ১৯৫৭ সালের প্রেস এ্যাকট, যার পরিধি কেবল সংবাদপত্রের ওপর নয়—সংবাদপত্র প্রকাশ, প্রচার, ছাপাখানা রাখা ও ব্যবহার করা এবং পুস্তকের ওপর বহাল হয়। কেবল ভারতীয়

www.pathagar.com

ভাষায় প্রকাশিত এবং ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রই নয়, এমন কি ইংরেজী ভাষায় ও ইংরেজ মালিকানাধীনদের জন্যেও তা ছিলো কার্যকর। সরকারী লাইসেন্স ব্যতিরেকে সংবাদপত্র প্রকাশ, প্রচার, ছাপাখানা রাখা, ব্যবহার করা, পুস্তক প্রকাশের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত এই এ্যাক্টের মেয়াদকাল ছিলো এক বছর। ''এই আইন দ্বারা যে নির্দেশ জারি করা হয়েছিলো তাতে বলা হয়েছে যে, সংবাদপত্র ভারতের বা ইংল্যাণ্ডের সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক বিবৃতি বা মন্তব্য মুদ্রণ থেকে বিরত থাকবে এবং এমন কোন সংবাদ প্রকাশ করবে না যা সরকারের উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার প্রতি আক্রমণাত্মক হতে পারে, অথবা সরকারের প্রতি জনমনে ঘৃণার ভাব উদ্রেক করতে পারে, বা সরকারের নির্দেশ অমান্য এবং অসন্তোষ সৃষ্টিতে উস্কানি যোগাতে পারে, বা আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে দুর্বল করার লক্ষ্যে বেসরকারী ও সামরিক কর্মচারীদের উস্কানি যোগাতে পারে, বা এমন কোনো মন্তব্য বা অভিমত প্রদান করা হতে পারে যা দেশীয় জনগণের মনে সরকারের প্রতি অসন্তোষ বা এমন ধারণার জন্ম দিতে পারে যাতে জনগণের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হয় যে, সরকার তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সাথে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।'' (গাজী শামছুর রহমান,সংবাদ বিষয়ক আইন পৃঃ-২৩৪, বাংলা একাডেমী, জুন '৮৪)। এই আইন যে একটি 'জরুরী অবস্থা'কালীন শাসক গোষ্ঠীর ভীতি ও শঙ্কারই প্রকাশ তা আইনের প্রতিটি শব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এর লক্ষ্য যে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থক সংবাদপত্র ছাপাখানা এবং পুস্তক প্রকাশনা বন্ধ রাখা তাও সহজেই বোধগম্য। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এলে এই জরুরী আপৎকালীন আইন রহিত যায়। এই সময়কালের মধ্যে সংবাদপত্রকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে এমন একটি মাত্র আইন প্রণীত হয়েছিলো তা হলো প্রেস এন্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস এ্যাক্ট ১৮৬৭।

কিন্তু যে জাতীয়তাবাদী চিন্তার উদ্‌গম ঘটেছিলো, এই যুদ্ধে যে স্বাধীনতা স্পৃহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলো তা যুদ্ধে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আপাত-পরাজয়ে শেষ হয় নি। আর সে কারণেই এ যুদ্ধের অবসানের পরও ভারতীয় ভাষাভাষী সংবাদগুলো জাতীয় মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে ধরে রাখতে চেয়েছে এবং তাদের লেখনীকে সেই মর্মে পরিচালনা করেছে যা ঔপনিবেশিক সরকারের জন্যে আনন্দজনক ছিলো না। তাই ১৮৭৮ সালে প্রণীত হয় ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট (১৮৭৮ সালের ৯ নং আইন।) এই আইনের বিশেষ দিক ছিলো উপমহাদেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সরকার-বিরোধী

www.pathagar.com

কার্যাকলাপের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনকে আরো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা (ঐ, পৃঃ ২৩৫)। এই আইনের করাল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই আইনের কার্যকারিতা রহিত হয়ে যায় ১৮৮০ সালে।

ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট প্রত্যাহার হওয়ার ফলে সংবাদপত্রের ওপর আপাতদৃস্ট নিয়নত্রণ অনেকটাই হ্রাস পেলো। ফলে সংবাদপত্রগুলো যতদুর সম্ভব স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে। এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে জনগণের মধ্যে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' মূলক মনোভঙ্গির জন্ম দেবে বলে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীকে এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে যে তারা ১৮৯১ সালে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক নতুন আইন প্রবর্তন করে। এই আইনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সর্বভারতীয় আইনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্য ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে তা ফিরে গেলো। বলা হলো যে, সংবাদপত্র সমূহের অধিকার ও স্বাধীনতা রাজ্য ও অঞ্চলসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং ঐ সীমার মধ্যেই তা আবদ্ধ থাকবে। উনবিংশ শতাব্দীর গোটা শেষ ভাগ জুড়েই এই আইনের আওতায় রাজ্যে রাজ্যে সংবাদগুলোর কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এই সময়কালে সংবাদপত্রের ওপর সংবাদপত্র সংশ্লিস্ট নিপীড়ক আইনের চেয়েও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যা তা হলো ১৮৭০ সালে প্রণীত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা, রাস্ট্রদ্রোহিতা সংশ্লিস্ট। এমন কি স্বাধীন বাংলাদেশেও বহাল এই ধারাটি পূর্ণ পাঠ আমি তুলে ধরছি ঃ

''১২৪-ক রাস্ট্রদ্রোহ ঃ যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর মাধ্যমে অথবা সংকেতসমূহের মাধামে বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির মাধ্যমে, অথবা প্রকারান্তরে আইন বলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা করার উদ্যোগ করে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন বা এমনতর যে কোন স্বল্পতর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যৎসঙ্গে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইবে অথবা এমনতর তিন বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে যৎসঙ্গে অর্থদণ্ড যোগ করা যাইবে, অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।''

এই বিধির পুনঃ পুনঃ ব্যবহারেই কেবল ব্রিটিশ শাসকেরা নিশ্চিন্ত হতে পারে নি, এর সাথে তারা ব্যবহার করতে থাকে দণ্ডবিধির ১০৮ এবং ১৪৪ ধারা (যার মর্মার্থ হচ্ছে কুকর্মে সহায়তা ও সশস্ত্র বেআইনী সমাবেশে উস্কানি দেয়া)। এ সবের পরও মধ্যে বিভক্তির চেস্টা। ভারতের সামাজিক ইতিহাসের পাশাপাশি এই আইনসমূহকে রাখলে দেখা যাবে যে, আইনের বাধন যেমন গোটা ভারতে মত প্রকাশের পথ বন্ধ করতে চেয়েছে, ঠিক তেমনি জনগণ তাদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন

www.pathagar.com

রচনার জন্যেও ব্রতী হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের (১৯১৯) পর থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন কৌশলে শাসনের যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো বলে অনুমিত হয় তারই ফল বোধকরি তেজবাহাদুর সাপরু কমিটির পরামর্শক্রমে ১৯২২ সালে ১৯০৮ ও ১৯১০ সালের আইন দু'টি রদকরণ। এই দুই আইন রদকরণের ফলে সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনতা লাভ করলো এই মত ব্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে এ কথা বলতে আমি আগ্রহী যে, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সরকার সংবাদপত্রের জন্যে নির্ধারিত আইন দিয়ে নয় সংবাদপত্রকে ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধির এবং ১৮৯৮ সালের প্রণীত ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ দিয়েই ঘায়েল করতে উৎসাহী ছিলেন। সরকারের অভ্যন্তরীণ গোপনীয় বিষয়াদি যাতে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে সে জন্যে তার ১৯২৩ সালে প্রণয়ন করা হয় Official Secrets Act. কিন্তু এই পদ্ধতি বেশিদিন কার্যকর রাখা সরকারের সম্ভব হয়নি, ১৯৩১ সালে Press (Emergency Powers) Act 1931 জারি করে সরকার নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে। এই আইন যদিও প্রত্যক্ষত হত্যার উস্কানি বা বল প্রয়োগে উৎসাহ যোগাতে পারে এমন সব প্রকাশের বিরুদ্ধে কার্যকর করার কথা; কিন্তু কার্যত আইনের এ ধারাকে অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার দুঃসাধ্য ছিলো না বা ব্যবহৃত হয়নি এমন নয়।

বিংশ শতকের ত্রিশের দশকের পর সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট আইন প্রণীত না হলেও দণ্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি এবং ইমারজেন্সী পাওয়ারস এ্যাক্ট বহু ভাবেই সংবাদপত্রের দমনে ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে 'রাষ্ট্র (রক্ষা) আইন ১৯৩৪,এর ৩ নং ধারা। এর কারণ হিসেবে আমি পূর্বেই ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি যে, এ পর্যায়ে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে এতটাই গতিশীল হয়ে ওঠে যে, নিবর্তনমূলক আইনগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যত অনেকদূর পর্যন্ত কাগুজে আইনে পরিণত হয়। তা ছাড়া প্রথম (১৯৩০), দ্বিতীয় (১৯৩১) এবং তৃতীয় (১৯৩২) গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান, কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ (১৯৩০ সালের লাহোর অধিবেশন, ২৬ জানুয়ারি' ৩০), চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাস ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ থেকে তখন এটা প্রায় স্পষ্ট •রূপ লাভ করে যে ভারতে নববিকশিত শক্তিগুলোকে বিবেচনায় রেখেই ভারতের রাজনীতি পরিচালিত হবে। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় (১৯৩৯) এবং মিত্র

শক্তিসমূহের চাপের মুখে ভারতের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সরকার নির্বাচনের বিষয়ে ব্রিটিশ শাসকরা নীতিগতভাবে সম্মত হন। দ্রেষ্টব্য ঃ বদরুদ্দীন উমর ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, পৃঃ

www.pathagar.com

১৪২-৪৩, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা,১৯৮৭)

এই পটভূমিকায়ই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের উদ্ভব ঘটে। দীর্ঘ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশ বিভক্তির ফলে এ রকম প্রত্যাশা অনেকের মনেই জাগ্রত হয় যে, সকল ধরনের নিবর্তনমূলক আইনের অবসান ঘটবে। সংবাদপত্র- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যাশা করেন যে, যে ধরনের কণ্ঠরোধী আইন ঔপনিবেশিক শাসকরা চাপিয়ে দিয়েছিলো তা আর কার্যকর থাকবে না। পরিবর্তে এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে যা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের পথে সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটাব।

পাকিস্তান আমলে বাস্তবে তা সংঘটিত হয়েছিলো কিনা সে আলোচনায় যাবার পূর্বে আজকের 'বাংলাদেশ' বলে পরিচিত ভূ-খণ্ডে সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক একটি আইনের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশ এই বলে পরিচিত ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত পত্রিকাটি হলো 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। রংপুরের বার্তাবহ যন্ত্রালয় থেকে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশিত এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে। ''রঙ্গপুর বার্তাবহ' টিকে ছিলো পুরো এক দশক। এটি প্রকাশিত হয়েছিলো এমন একটি সময়ে যখন সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু ক্রমশ বেশি করে রাজনীতিমুখী হতে শুরু করেছে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়টিতে সম্ভবত এই পত্রিকাটিরও প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠে রাজনীতি।

সে কারণেই এই সংগ্রামের ব্যর্থতার পরপরই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকল্পে লর্ড ক্যানিং '১৮৫৭ সনের পনের আইন' প্রবর্তন করার পর রঙ্গপুর বার্তাবহের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়'' (সুব্রত শংকর ধর, বাংলাদেশের সংবাদপত্র, পৃ. ১৬, বাংলা একাডেমী, ভাষা শহীদ গ্রন্থমালা, ডিসেম্বর '৮৫)। ক্যানিং প্রবর্তিত এই আইনটি ১৮৫৭ সালের জুনে প্রবর্তিত হয় এবং এক বছর কাল চালু থেকে ১৮৫৮ সালের জুনে প্রত্যাহৃত হয়।

এই আইনের সূত্র ধরে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসের **এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পুনরুচ্চারণ করার কারণ হলো যে, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা সূচনাতেই এ ধরনের একটি নিবর্তনমূলক আইনের শিকার হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া। এই সংবাদপত্রটি প্রকাশের একশো বছর পর এই অঞ্চলটি একটি ''স্বাধীন'' রাষ্ট্রের**

নিরস্ত হয়নি তারা। ১৮৯৮ সালে প্রণয়ন করে দণ্ডবিধি ১৫৩-ক ধারাটি। ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বাংলাদেশে কার্যকর এই ধারাটি নিয়ে আমরা বাংলাদেশ পর্যায়ে আলোকপাত করবো।

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ভারতে, বিশেষত তৎকালীন বাংলাদেশে একটি সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সশস্ত্র আন্দোলন বিকাশের পাশাপাশি এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সংবাদপত্রের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা মোকাবেলার জন্যে ১৯০৮ সালে প্রণীত হয় Newspaper (Incitement to Offence) Act 1908. ''এই আইন ম্যাজিস্ট্রেটকে এমন ক্ষমতা প্রদান করে যার ফলে ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে কোন সংবাদপত্র হত্যার উস্কানি দিচ্ছে বা বল প্রয়োগে লিপ্ত হতে উৎসাহিত করছে বা বিস্ফোরক আইনের অধীনে বা আওতায় কোনো অপরাধে লিপ্ত আছে তা হলে তিনি সেই সংবাদপত্র এবং ছাপাখানা সরকারী দখলে আনয়ন করতে পারবেন।'' এই আইন ম্যাজিস্ট্রেটকে ডিক্লারেশন বাতিলের ক্ষমতা পর্যন্ত প্রদান করে।

এই নতুন আইনের ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল কাগজই কেবল বন্ধ হয়নি, বন্ধ হয়ে গেছে এমন কি 'নিরপরাধ' সংবাদপত্রও। এই আইনের আওতাকে আরো সম্প্রসারিত করা ১৯১০ সালে প্রেস এ্যাক্ট-এ। সকল মুদ্রণালয়কে টাকা জামানত প্রদানে বাধ্য করা এবং ১৯০৮-এর আইনের আওতায় অপরাধমূলক কোনো কাজে ব্যাপৃত আছে এরকম সন্দেহে এ জামানত বাতিল করার বিধান এ আইনের বৈশিষ্ট্য। এ আইনে বিধান রাখা হয় যে দুবার জামানত বাতিল হবার পর তৃতীয় দফায় কেবল জামানতই নয় ছাপাখানা ও সংবাদপত্র উভয়ই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। পোস্ট মাস্টাররা সন্দেহ করলে যে কোন লেখা বা পত্রিকা (চিঠি ব্যতিরেকে) আটকে রাখতে পারবেন—এমন বিধানও চালু করে দেয়া হয়। দু বছর পরে (১৯১২) সংবাদপত্র প্রকাশের স্থান পরিবর্তন, মালিক/ প্রকাশকের স্বল্পমেয়াদী অনুপস্থিতির জন্যেও ডিক্লারেশন বাতিলের ব্যবস্থা এই আইনে যুক্ত করা হয়।

১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হলে Defence of India Regulations 1914 জারি করা হয়।এই আইন আপৎকালীন হিসেবেই কেবল জারি হয় নি, তা ব্যবহৃত হয়েছে সরকাররের যে কোনো ধরনের সমালোচনাকে মোকাবেলা করার জন্যেও।

এ সকল আইন সংবাদপত্র শিল্পকে এমনিভাবে পঙ্গু ও অসহায় অবস্থার মুখোমুখি করে ফেলেছিলো যে প্রায় সকল সংবাদপত্র কোনো না কোনো ভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তবে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে,ইতোমধ্যেই ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছে এবং তা গোটা ভারতেই নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে। জাতিসত্তার মুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি চলছে এরই অংশে পরিণত হলেও তার সংবাদপত্রগুলো স্বাধীনতা'র আস্বাদ পায় নি।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটার সময়টিতে পূর্ব বাঙলা থেকে প্রকাশিত সংবাদ ছিলো একেবারেই নগণ্য। বিভাগ-পূর্বকালের সংবাদপত্রগুলোর অধিকাংশই দেশ বিভক্তির কারণে সৃষ্ট সামাজিক পরিস্থিতিতে অকার্যকর হয়ে পড়ায় তাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে পাকিস্তান-সমর্থক বা মুসলিম মালিকানাধীন বহু সংবাদপত্রই থেকে যায় কলকাতায়। তবে পঞ্চাশের দশকে সূচনায় এসে দেখা যায় যে, বহু পত্রিকা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে এবং ঢাকার বাইরে থেকে বহু সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।

সংবাদপত্রের বিকাশকালীন সময়টিতে পাকিস্তানে সাংবাদপত্রের জন্যে আলাদা করে আইন প্রণয়ন তো দূরে থাক দেশ পরিচালনার জন্যে একটি শাসনতন্ত্র পর্যন্ত তৈরি হয়নি। তবে ব্যতিক্রমও আছে, ১৯৫০ সালে দণ্ডবিধিতে নতুন দেশের উদ্ভব সম্পর্কে একটি ধারা যুক্ত করে লিখিত বা মৌখিকভাবে তার বিরোধীতাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয়। পঞ্চাশের দশকের মধ্য-পর্ব পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যেমন তেমনি সংবাদপত্রকে হুঁশিয়ার করার ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়েছে প্রাদেশিক জন নিরাপত্তা আইন ও ১৯৫২ সালে প্রণীত পাকিস্তান আইনের ১১ ও ১২ ধারা (Security of Pakistan Acts 1952)।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতির বহু ঘটনা আকীর্ণ একটি সময়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ক্ষমতায় আরোহণ, ৪৫ দিন ক্ষমতায় থাকা, ৯২ক ধারা জারি করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া, খসড়া সংবিধান প্রণয়ন, আওয়ামী লীগে ভাঙন, প্রাদেশিক পরিষদের অভ্যন্তরে হাঙামায় ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর মৃত্যুবরণ এবং সবশেষে সামরিক শাসন জারির এই ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সংবাদপত্রসমূহ ন্যূনতম স্বাধীনতা ভোগ করেছে বটে; কিন্তু ৯২ক ধারার মতো একটি খড়গ তাদের মাথার ওপরে ঝুলন্ত রাখা হয়েছে। তার ব্যবহারও কম হয়নি।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির সাথে সাথে সংবাদপত্রসমূহে সামরিক শাসন জারির সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরের দিন প্রদেশের সামরিক আইন পরিচালক মেজর জেনারেল ওমরাও খান যে ৩৫ নং সামরিক আইন বিধি জারি করেন তাতে বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তি লিখিত বা মৌখিকভাবে জনগণের মধ্যে হতাশা, আতঙ্ক, বা সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাকে ১৪ বৎসর

www.pathagar.com

সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড দেয়া হবে। এই প্রাদেশিক সামরিক আইন বিধি রহিত করে ১১ অক্টোবর ('৫৮) সারা পাকিস্তানের জন্যে ঐ বিধির অনুরূপ সামরিক আইন বিধি ২৪ জারি হয়। এ ছাড়াও জারি করা হয় ৩৪ নং সামরিক আইন বিধি ঃ ''যে কোনো ব্যক্তি মুখের কথায় অথবা লিখিতভাবে অথবা যে কোনভাবে প্রাদেশিকতা, শ্রেণীগত ভিত্তিতে এইরূপ গুজব বা বিবরণ প্রকাশ করিবে—যাহার দ্বারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অথবা শাসন কার্যের ব্যাপারে ভাঙন সৃষ্টি করিতে পারে, সে ক্ষেত্রে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে।'' এই সব সামরিক আইন বিধি যে কোনো ধরনের মত প্রকাশের পক্ষকেই রুদ্ধ করে ফেলেছিলো। আর মত প্রকাশের সব পথ যখন রুদ্ধই হয়ে যায় তখন সংবাদপত্রগুলো বেঁচে থাকবে কিসের ওপর ভিত্তি করে? এই কারণেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সামরিক শাসনের এই সময় পরিধিতে সংবাদপত্রের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। (১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পূর্বে দৈনিকের সংখ্যা ছিল ১৮টি, '৫৯ সালে ১৪টি, '৬১ সালে ১২টি।)

সামরিক শাসনামলে কেবল সামরিক আইন বিধিগুলোই যে কেবল বহাল ছিলো তা নয়। ১৯৫৯ সালের মার্চে প্রেস কমিশনের রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে একজন গবেষক জানান যে, ঐ সময় সংবাদপত্রের সাথে সম্পূর্ণ বা আংশিক সংশ্লিষ্ট আইনগুলো হচ্ছে ঃ

প্রেস এণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস এ্যাক্ট ১৮৬৭,
সংবাদপত্র (জরুরী ক্ষমতা) আইন ১৯৩১,
রাষ্ট্র (অননুরাগের বিরুদ্ধে রক্ষা) আইন ১৯২২,
সরকারী তথ্য গোপনীয়তা আইন ১৯২৩,
রাষ্ট্র (রক্ষা) আইন ১৯৩৪ (ধারা নং ৩),
বৈদেশিক সম্পর্ক আইন ১৯৩২ (ধারা নং ৩),
দণ্ডবিধি ১৮৬০ (মূলত ১২৩ ক, ১২৪ ক, ১৫৩ ক, ৪৯৯ ও ৫০৫ ধারা)
ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (৯৯ ক থেকে ৯৯ছ ধারা)
সমুদ্র শুল্ক আইন ১৮৭৮ (১৯ এবং ১৮১ ক থেকে ১৮১ গ ধারা),
টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫ (৫ নং ধারা),
ডাকঘর আইন ১৮৯৮ (২৭ ক থেকে ২৭ ঘ ধারা)
পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন (১১ ও ১২ ধারা) এবং
প্রাদেশিক জন নিরাপত্তা আইনসমূহ।
(সুব্রত শংকর ধর, বাংলাদেশের সংবাদপত্র, পৃঃ ৭৪, বাঙলা একাডেমী, ভাষা শহীদ গ্রন্থমালা, ডিসেম্বর ১৯৮৫)

এই সকল নিপীড়ক ও কণ্ঠরোধী আইন শাসকগোষ্ঠীকে শঙ্কামুক্ত করতে পারেনি। আর তাই সামরিক আইনের আওতার

www.pathagar.com

মধ্যেই ১৯৬০ সালে জারি করা হয় প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স। ১৮৬৭ সালের প্রেস এণ্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস এ্যাক্ট এবং সংবাদপত্র (জরুরী ক্ষমতা) আইন ১৯৩১-এর সমন্বিত রূপ হচ্ছে এই অর্ডিন্যান্স। অধ্যাদেশের ৬৩ নং ধারায় বলা হয় যে, এই অর্ডিন্যান্স সত্ত্বেও সংবাদপত্র-সংশ্লিষ্ট পূর্বতন আইনসমূহ বহাল থাকবে। এই অধ্যাদেশে প্রেস মালিক ও প্রকাশকের কাছে থেকে জমানত রাখবার ব্যবস্থা থাকলো, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংবাদপত্রের সন্ধানে যে কোনো খানাতল্লাসী চালাবার অধিকারও দেয়া হলো সরকারকে।

১৯৬২ সালে এ দেশে ছাত্রদের যে ব্যাপক আন্দোলন সংঘটিত হয় তার প্রতি কোনো কোনো সংবাদপত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনও ছিলো ঐ আন্দোলনের প্রতি। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে দণ্ডবিধি'তে ১৫৩খ ধারা যুক্ত করা হয়। এই ধারায় বলা হয়, ''যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সঙ্কেতসমূহের বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে বা প্রকারান্তরে যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণী বা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহশীল বা তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমন কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ করে, যাহা গণশৃঙখলা নষ্ট করে বা খর্ব করে, অথবা যাহার গণশৃঙখলা নষ্ট বা খর্ব করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাদের মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।'' এই আইন এবং '৬০-এর অর্ডিন্যান্সের বলে প্রায় সকল পত্রিকাই তখন প্রি-সেন্সরশীপের পর পাঠকদের হাতে পৌঁছুতো। '৬২ সালের শেষ পর্যায়ে ছাত্রদের শিক্ষা অন্দোলনের ব্যাপারে সমর্থকের ভূমিকা নেয়া এবং সরকারী বক্তব্য 'যথাযথ'ভাবে প্রকাশ না করার কারণে সরকার কতিপয় সংবাদপত্রকে 'কালো তালিকাভুক্ত' বা 'ব্লাক লিস্ট' করে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আইনের অতিরিক্ত এই কৌশলটি আজও আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

'কালো তালিকাভুক্তি'র পরও যখন সংবাদপত্রগুলোর কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত আচরণ লাভে সরকার ব্যর্থ হন তখন ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে জারি হয় প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬৩। এই অধ্যাদেশ বলে সরকারী প্রেস নোট এবং তথ্য বিবরণী পুঙখানুপুঙখ মুদ্রণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। এর অন্যথা হলে শাস্তির বিধি বিধান রাখা হয় (অবশ্য এই নিয়ে সাংবাদিকদের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে তার বেশ কিছু ধারা অক্টোবরে রহিত হয়ে যায়)।

'৬২-পরবর্তী এই সকল অভিজ্ঞতা তৎকালীন সরকারকে এই

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ করে তোলে যে, সরকারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্র থাকা কেবল বাঞ্ছনীয় নয়—জরুরীও বটে। আর তাই ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট'। প্রত্যক্ষ সরকারী মালিকানাধীন সংবাদপত্রের ধারণার সেই প্রথম বাস্তবায়ন।

সরকারের নিজস্ব প্রচারণার জন্যে নিজস্ব কাগজ প্রকাশ সত্ত্বেও অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোর উপর 'নিয়ন্ত্রণ' ও 'কণ্ঠরোধ' প্রচেষ্টার অবসান হয়নি। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ '৬৬ সালের ৮ জুনের সংবাদপত্রসমূহ। ৬ দফা আন্দোলনে ঢাকায় ৭ই জুন যা ঘটেছিল সকল সংবাদপত্র তার বর্ণনা সমৃদ্ধ প্রেসনোটই কেবল ছাপাতে পেরেছে—তার বেশি একটি শব্দও নয়। এই আন্দোলনকে সমর্থন করায় দীর্ঘ দিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায় 'ইত্তেফাক'।

পরবর্তী ঘটনাবলী আমাদের প্রায় সকলের স্মৃতিতে জাগরূক আছে। কেবল সংবাদপত্র নয়, গোটা জাতির কণ্ঠরোধের সকল প্রয়াসকে চূর্ণ করে সংঘটিত হয় ছাত্র-জনতার মহান অভ্যুত্থান—১৯৬৯ সালে। সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বাঙলাদেশ জাগ্রত হয় এবং রাজপথের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই নিজের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করে নিতে থাকে। জনতার ক্রোধ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হয় প্রেস ট্রাস্ট ভবন।

এই পটভূমিকায়ই ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানে দ্বিতীয় দফা সেনা-শাসন জারি হয়। ২৬ মার্চ থেকে জারি হতে থাকে দফায় দফায় বিভিন্ন ধরনের বিধি। সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট এ ধরনের তিনটি বিধি—৬, ১৭ ও ১৯ নং জারি হয়। যার মর্মার্থ হলো কোনোভাবেই সামরিক শাসনের ও সরকারের সমালোচনা করা যাবে না। সর্বোচ্চ ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান সম্বলিত এই সকল বিধি সংবাদপত্রসমূহকে মেনে নিতেই হয়েছে। কিন্তু সত্তরের নির্বাচনের অগেই এগুলো কার্যত শিথিল হয়ে পড়ে।

এরপর আসে ৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন। ১ মার্চ জারি করা হয় ১১০ নং সামরিক আইন বিধি। ''পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ছবি, খবর অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রমসূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লঙ্ঘন করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।'' অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল জনজোয়ারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সংবাদপত্র ও সাংবাদিক কেউই এই বিধির প্রতি সামান্য কর্ণপাতও করেন নি। বোধকরি বাংলাদেশের ইতিহাসের একমাত্র এই ২৫টি দিনই হচ্ছে একমাত্র সময় যখন সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীনভাবে। মত প্রকাশ করেছে।

পরবর্তী ৯ মাস অধিকৃত বাংলাদেশের এলাকাগুলো থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের ওপর জারি হয়েছে বহুবিধ সামরিক বিধি। সে সব বিধি নিয়ে আমি আলোচনায় যাব না। কেননা

www.pathagar.com

যুদ্ধকালে দখলদার বাহিনীর আইন কোনো অবস্থাতেই আইনসঙ্গত বলে আমি মনে করি না। তবে দুটো ঘটনার দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত, একটি সেন্সরশীপ হাউস স্থাপন এবং দ্বিতীয়ত, টেলিফোনের মাধ্যমে 'প্রেস এ্যাডভাইস' প্রদানের ঘটনা। অধিকৃত ন'মাস ঢাকায় তথ্য দফতর এবং ISPR (Inter Services Public Relations) বিভাগের প্রিসেন্সরশীপই কেবল বহাল ছিলো তা নয়। এর অতিরিক্ত হিসেবে লিখিত এবং মৌখিক (টেলিফোনে) প্রেস এডভাইস পাঠানো হতো প্রতিদিন।

সরকারের তথ্য দফতরের এই মৌখিক 'প্রেস এডভাইস'-এর বিষয়টি চমকপ্রদ এবং নতুন। এবং এই পদ্ধতিটি স্বাধীন বাংলাদেশে '৮২ সালের সামরিক শাসন জারির পর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত পদ্ধতি।

বাংলাদেশ আমল

তেইশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রাম ও ন'মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের শেষে দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে প্রত্যাশা করা হয়েছিলো যে, স্বাধীন বাংলাদেশের মত প্রকাশের ওপর কোনো রকম বাধা-নিষেধ থাকবে না। স্বাধীনতা লাভের ৩ মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, বাংলাদেশ সরকার একটি মুক্ত ও দায়িত্বশীল সংবাদ ক্ষেত্রে (press) বিশ্বাসী (The Bangladesh Observer, March 3, 1972)। তাঁর এই মন্তব্য গোটা সাংবাদিকতার জগতের সকলের কাছেই ছিলো প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু এরই পাশাপাশি এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকলো যা থেকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অনেকেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো ৪টি সংবাদপত্রের ভার সরকারের হাতে তুলে নেয়া এবং ১৯৬০ সালের প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেন্স অর্ডিন্যান্সটি বহাল রাখা। শুধু তাই নয় 'দায়িত্বশীল' সাংবাদিকতা প্রত্যাশী সরকার একটি শাসনতান্ত্রিক জটিলতার প্রশ্ন উত্থাপন করায় অবজার্ভার সম্পাদক আব্দুস সালামকে চাকরিচ্যুত করলেন (১৫ মার্চ '৭২ সালের অবজাভার-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয় Supreme Test)।

একথাও অনেকেই অনুমান করলেন যে, সদ্য-স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং সুস্পষ্ট সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এ ধরনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস মাত্র, সংবিধান প্রণীত হলেই এগুলো অপসারিত হবে। কিন্তু সংবিধান রচনা শেষ হবার আগেই (৪ নভেম্বর '৭২) সংবাদপত্রের ওপর নেমে আসে বিভিন্নমুখী হামলা— সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা, সম্পাদক গ্রেফতার, সম্পাদকের নামে

www.pathagar.com

হুলিয়া জারি এবং সংবাদপত্র কার্যালয় জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা (৭ সেপ্টেম্বর '৭২ চট্টগ্রাম, দেশবাংলা কার্যালয়) তারই অন্যতম। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের প্রথম সংবিধান কার্যকর হলো। এই সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো। এই অনুচ্ছেদের পূর্ণ পাঠটি হচ্ছে এই রকম ঃ

''৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙখলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের; এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার
নিশ্চয়তা দান করা হইল।''

আপাত-দৃষ্টে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হলেও এই অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদে যখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধের কথা বলা হয়েছে তারই ফাঁক গলিয়ে টিকে গেলো সমস্ত রকম দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধিগুলো। এ প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত সংশ্লিষ্ট দণ্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি সমূহ কিন্তু পাকিস্তান আমলে বাতিল বা পুনর্লিখিত হয় নি, বাংলাদেশেও নয়। যৎকিঞ্চিত যা পরিবর্তিত হয়েছে তাতে মর্মবস্তুর কিছুই আসে যায় না। যেমন ধরা যাক ১৮৯৮ সালে প্রণীত দণ্ডবিধির ১৫৩-ক ধারাটি। এই ধারায় বলা হচ্ছে ঃ

''১৫৩-ক। যে ব্যক্তি, কথিত বা লিখিত শব্দাবলী সাহায্যে বা সঙ্কেতাদি, দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে বা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের নাগরিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাবে সৃষ্টি করে বা সৃষ্টির উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে/বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।''

যে দেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্র হচ্ছে জাতীয় মূলনীতি সে দেশে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর বিদ্বেষ সৃষ্টি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কি করে হতে পারে ? আইন তৈরি করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা আমি করি না, কিন্তু সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে জাতীয় মুলনীতি ঘোষণার পর এ ধরনের আইন কি স্ব-বিরোধী নয়?

www.pathagar.com

যাই হোক সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার 'নিশ্চয়তা' প্রদত্ত হলো বটে কিন্তু তার ঠিক বিপরীত কর্মকাণ্ড চলতে থাকলো দেশ জুড়ে ১৯৬০ সালের প্রেস অর্ডিন্যান্সের জোরে কিংবা রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা বলে। এই স্ববিরোধিতা থেকে সরকার নিজেকে মুক্ত করলেন ১৯৭৩ সালে। ২৮ আগস্ট ঘোষিত হলো ''প্রিন্টিং প্রেসেস এণ্ড পাবলিকেশন্স (রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অর্ডিন্যান্স '৭৩''। এই অধ্যাদেশ কার্যত ১৯৬০ সালের অধ্যাদেশেরই অনুলিপি মাত্র। সংবাদপত্রগুলোর ওপর সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত করা এবং ভিন্নমত প্রকাশের জন্যে আটক, সংবাদপত্র বেআইনী ঘোষণার ব্যবস্থাও রাখা হলো। এই অধ্যাদেশ সেপ্টেম্বরে সংসদে অনুমোদন লাভ করলো।

এরপর এলো সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন '৭৩। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান সম্বলিত এই আইনে এমন ব্যবস্থা করা হলো যাতে রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী আইন জারি করে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করতে পারবেন এবং সে বিষয়ে আদালতেও প্রশ্ন তোলা যাবে না। মত প্রকাশের মত মৌলিক অধিকার খর্বের এই ব্যবস্থার অধীনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তো থাকতেই পারে না। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে দেশে যখন প্রথম বারের মতো এই আইনের প্রয়োগ ঘটলো তখন সঙ্গত কারণেই সংবাদপত্রগুলো হয়ে পড়লো সরকারী ভাষ্য আকীর্ণ ছাপা কাগজ মাত্র।

জরুরী আইনের বিধান প্রয়োগের পূর্বেই আরো দু'টি আইন প্রণীত হয় যা সরাসরি সংবাদক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। প্রথমটি হলো বিশেষ ক্ষমতা আইন ৭৪। ৫ ফেব্রুয়ারি সংসদে পাশকৃত এই আইনের বলে সরকার যে-কোনো ব্যক্তিকে কোন কাজে থেকে বিরত রাখার জন্যে আটকে রাখতে পারবেন এবং তার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য অভিযোগ আনা হলেও তিনি জামিন পাবেন না। প্রেস সেন্সরশীপের ব্যবস্থা নিতে পারবেন, সংগঠন গঠনের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ ও নিষিদ্ধ করতে পারবেন। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এই আইনের পরিধি যে কতটা ব্যাপক তা বোঝা যায় বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের একটি বিবৃতি থেকে। এই আইন সম্পর্কে ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে বলেন, ''এই আইনে সংবাদ প্রকাশে বাধা আরোপ যে-কোনো সংবাদ প্রকাশের জন্যে এমন কি এই আইন রচনার পূর্বে প্রকাশিত কোনো সংবাদের জন্যে ও ছাপানোর মুদ্রাকর, প্রকাশক, রিপোর্টার এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে, পত্রিকার জামানত তলব করা যাবে। এই আইনের শর্ত অনুযায়ী সরকার দৃশ্য, অদৃশ্য, সত্য বা মিথ্যা যে কোনো সংবাদ আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী মনে করলে ব্যবস্থা নিতে

www.pathagar.com

পারবেন'' (দৈনিক বাংলা,১১ ফেব্রুয়ারি'৭৪)। দ্বিতীয়টি হলো 'ছাপাখানা ও প্রকাশনা বিল'। নভেম্বর '৭৪-এ সংসদে পাশকৃত এই বিলে এমন কথা রয়েছে যে, ''যদি কোনো সংবাদপত্রে এমন কিছু প্রকাশ করা হয়, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলার বা কোনো অপরাধ সংগঠনে কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে অথবা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে অথবা যে কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রীতির সম্পর্ক বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, তা হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে পারবেন'' (রেজোয়ান সিদ্দিকী, কথামালার,রাজনীতি ১৯৭২-৭৯ পৃঃ-৭৭, নওরোজ কিতাবিস্তান,ঢাকা,,১৯৮৪)। এ দুটি আইন স্ব-ব্যাখ্যাত (Self Explanatory)। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা বাহুল্য। এ ধরনের আইন থাকার পর সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ বর্ণিত সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা কতটা নিশ্চিত তা বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় কণ্ঠরোধ আইনটি প্রণীত হয় '৭৫ সালের ১৬ জুন ঃ 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ'। একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে ঐ আইনের বিধান বলে দেশে কয়েকটি সংবাদপত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেখে অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই ডিক্লারেশন বাতিল হয়ে যায়।

এর পরবর্তী ইতিহাস বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন এবং সামরিক শাসন সংবাদপত্রকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সালের উদাহরণ থেকেই আশা করি তা স্পষ্ট। বাংলাদেশের সামরিক শাসকরা ১৯৭৫ সালে তা থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন কোনো ভূমিকা পালন করেন নি। সামরিক আইনের যে বিধিগুলো জারি হয়েছিলো তার পরিচিতিসূচক সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই ভিন্ন ছিলো, কিন্তু অভিন্ন ভাষায় রচিত এই সকল সামরিক বিধি একইভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছে, কণ্ঠরোধ করেছে। তবে সামরিক শাসন জারির ১ সপ্তাহের মধ্যেই (২২ আগস্ট) 'সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ' বলে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করে ২টি সংবাদপত্র পূর্বের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয় (ইত্তেফাক, সংবাদ) এবং পর্যায়ক্রমে বাকিগুলোর ব্যাপারেও একই ব্যবস্থার আশ্বাস দেয়া হয়। এই অবস্থায়ই ৭ই নভেম্বরের সিপাহী অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (৭৮), সংসদ নির্বাচন (৭৯), সামরিক আইন প্রত্যাহার সবই হয়েছে কিন্তু যে সকল ব্যবস্থাদি স্থায়ীভাবে সংবাদপত্রকে সরকারের করতলগত

www.pathagar.com